বাংলাপিডিএফ.নেট

# প্রি য় জ ন

ইমদাদুল হক মিলন

AKAS SUVOM

# প্রিয়জন

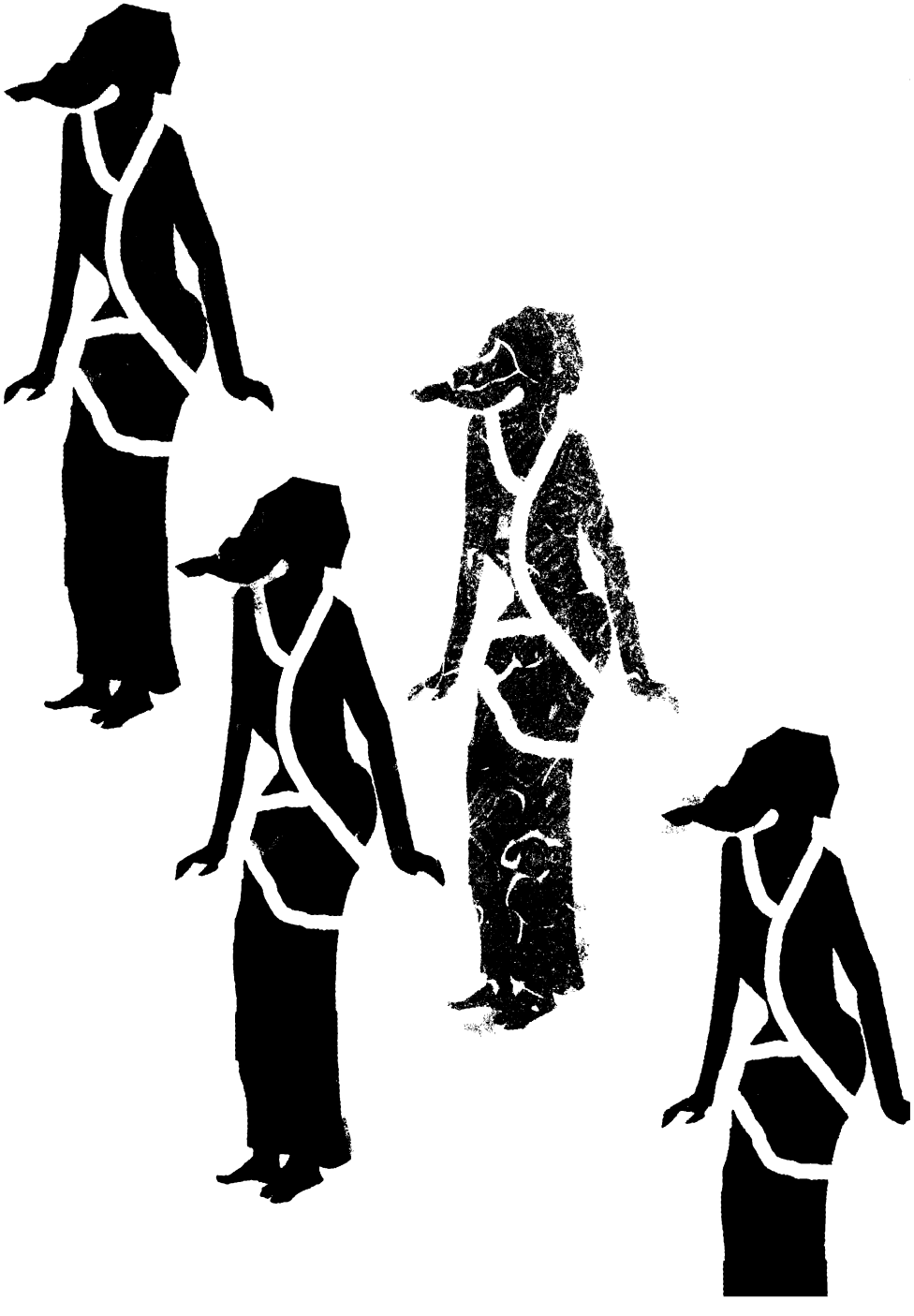

ইমদাদুল হক মিলন

# প্রিয়জন

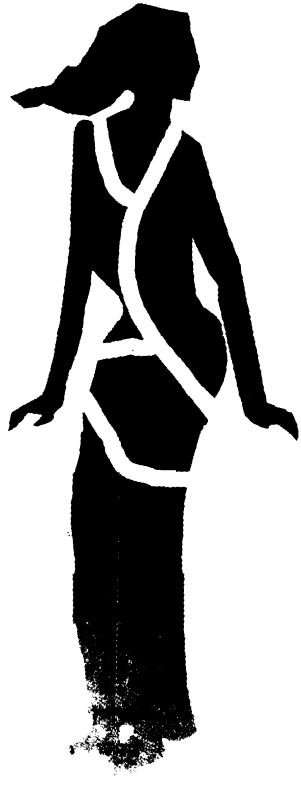

এশিয়া পাবলিকেশন্‌স

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

# শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

চতুর্থ মুদ্রণ ❑ জুন ২০০০

তৃতীয় মুদ্রণ ❑ ডিসেম্বর ১৯৯৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ ❑ একুশে বইমেলা ১৯৯৮

প্রথম এশিয়া সংস্করণ ❑ অক্টোবর ১৯৯৭

স্বত্ব ❑ নির্বাচিতা হক ❑ শুভেচ্ছা হক

প্রকাশক ❑ ইসমাইল হোসেন বকুল এশিয়া পাবলিকেশনস্ ৩৬/৭ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

কম্পোজ ❑ বাড কম্প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশনস্ ৫০ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ ❑ সালমানি মুদ্রণ সংস্থা চৌধুরী মার্কেট ৩০/৫ নয়াবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ❑ সমর মজুমদার

মূল্য ❑ ৫০.০০ টাকা

ISBN-984-8152-54-07

# প্রিয়জন

## ইমদাদুল হক মিলন

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

## গোলাম মাওলা আকাশ

**SCAN & EDITED BY:**

# SUVOM

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট

**(fb.com/groups/Banglapdf.net)**

বইপোকাদের আড্ডাখানা

**(fb.com/groups/boiipoka)**

এর সৌজন্যে নির্মিত

**WEBSITE:**

**WWW.BANGLAPDF.NET**

উৎসর্গ

দূরের মানুষ, তুমি আমার মনের মাঝে রাখা

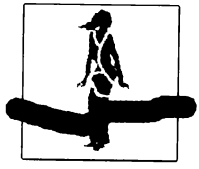

রাজু চিৎকার করে ডাকল, খালা, ও খালা!

পালঙ্কের ওপর পুরনো আমলের কিছু পেয়ালা পিরিচ ফুলদানি এবং রেকাবি নিয়ে বসেছেন খালা। হাতে ছেঁড়াখোড়া পাতলা ধরনের একটা তোয়ালে। অতিশয় যত্নে তোয়ালে দিয়ে জিনিশগুলো মুছছিলেন তিনি। রাজুর ডাকে হাত থেমে গেল তাঁর। পালঙ্কের পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। তাকিয়ে রাজুকে দেখতে পেলেন।

মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিলেন বলে চশমাটা নাকের ডগা বরাবর নেমে এসেছে। চশমাটা ওপরদিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে নরম শান্ত গলায় বললেন, কে রে, রাজু? আয়, ঘরে আয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল রাজু। তার পরনে জিনসের পুরনো ময়লা নোংরা একটা প্যান্ট। প্যান্টের বাঁ হাঁটুর কাছটা ফেঁসে গেছে। গায়ে ঢোলাঢালা শাদা একটা গেঞ্জি। দেখেই বোঝা যায় গেঞ্জিটা বিদেশি। পুরনো কাপড়ের দোকান থেকে সস্তায় কিনেছে রাজু।

রাজুর পায়ে জুতো স্যান্ডেল কিছু নেই। সে সাধারণত পরেও না। খালিপায়েই থাকে। আজ তার পায়ের পাতা ধুলোয় শাদা হয়ে আছে। প্যান্ট ফোল্ড করে রেখেছে গোড়ালির ওপর। প্যান্টের ভাঁজেও লেগেছে ধুলো। দেখে বোঝা যায় ধুলোবালিতে খুব হাঁটাহাঁটি করেছে সে আজ। রাজুর মুখে পনেরো বিশ দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ। মাথায় ঝাঁকড়া চুল বেশ লম্বা হয়েছে। দেখে বোঝা যায় বেশ অনেক দিন নাপিতের কাছে যায় না সে।

ঘরে ঢুকে খুবই চঞ্চল গলায় রাজু বলল, কী করছ খালা?

খালা চোখ তুলে একবার রাজুকে দেখলেন। তারপর হাতের কাজ চালিয়ে যেতে যেতে বললের, ময়লা জমেছে।

কোথায়?

পেয়ালা পিরিচে।

রাজু হেসে ফেলল। তোমার এসব জিনিশে কদিন পরপর ময়লা পড়ে খালা?
খালা চোখ তুলে রাজুর দিকে তাকালেন। কেন?
যখনই আসি তখনই দেখি তুমি রেকাবি ফুলদানি পেয়ালা পিরিচ মুছছ। এত মোছামুছির কী আছে!
যত্ন না নিলে কোনও জিনিশই ঠিক থাকে না।
যত্নটা তুমি একটু বেশি নিচ্ছ।
কী করব, একটা কোনও কাজ তো করতে হবে।
হ্যাঁ এই বয়সে কাজ করা ভাল। কাজ করলে শরীর ঠিক থাকবে। অসুখবিসুখ হবে না। এজন্যেই করি।
কিন্তু বসে বসে এইসব খুটখাট কাজ শরীরের কোনও কাজে লাগবে না।
তা হলে?
হাঁটাচলা করো। সকালবেলা বিকেলবেলা বাগানে হাঁটাহাঁটি করবে। তোমাদের এতবড় বাগান পড়ে আছে! বাগানের মাঝখানে অত সুন্দর পুকুর!
খালা বলল, পুকুর আছে তো কী! পুকুরের জলে নেমে হাঁটব নাকি!
রাজুও হাসল। আরে না! তুমি গোসল করবে পুকুরে নেমে। সাঁতার কাটবে। সাঁতার শরীরের জন্যে সবচে ভাল ব্যায়াম।
বুঝলাম।
রাজু আর কথা বলল না। পালঙ্কের এক কোণে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল। বসে বাচ্চা ছেলের মতো পা দোলাতে লাগল।
খালা বলল, ওকী?
রাজু অবাক হল। কী?
পা দোলাচ্ছিস কেন?
দোলালে কীহয়?
তুই কি দিনদিন বড় হচ্ছিস, না ছোট!
রাজু হাসল। তোমাদের পালঙ্কটা এত উঁচু খালা, বসলে পা মাটিতে লাগে না। দোলাতে ভারি আমোদ লাগে।
তারপর একটু থেমে রাজু বলল, হাসি আপা কই?
স্কুলে গেছে।
স্কুলে মানে! হাসি আপা কি আবার স্কুলে ভরতি হয়েছে নাকি?
খালা আবার চোখ তুলে রাজুর দিকে তাকালেন। তুই কী রে!
কী?

হাসি স্কুলে ভরতি হবে কী রে!
ভুল হয়ে গেছে। হাসি আপা তো মেয়েদের স্কুলের টিচার। বি এ পাশ।
তবে নিজের স্কুলে আজ যায়নি হাসি। স্কুল বন্ধ।
তবে?
টুপুর স্কুলে গেছে।
কেন? টুপুকে না পরী স্কুলে নিয়ে যায়?
হ্যাঁ।
তা হলে?
পরী আজ যায়নি।
কেন?
হাসিই পরীকে আজ যেতে দেয়নি। বলল আমার স্কুল বন্ধ, আমি আজ টুপুকে স্কুলে নিয়ে যাই। পরী বাড়ির কাজটাজ করুক।
পরী কোথায়?
আছে।
ডাকো-না!
কেন?
আমাকে একটু চা-নাশতা দিক।
সকালবেলা তুই আজ নাশতা করিসনি?
না।
কেন?
মা খুবই ফায়ার হয়ে আছে, নাশতা দেয়নি।
ঠিকই করেছে।
মানে?
এত বড় হয়েছিস তুই, না লেখাপড়া শিখলি না কোনও কাজকাম। সারাদিন টোটো করে ঘুরে বেড়াস। এভাবে দিন যাবে!
তো কী করব?
একটা-কিছু কর।
কী করব তাই তো জানতে চাইছি।
বাজারে দোকান-টোকান কর, নয়তো নিজেদের জমিগুলো নিজেই চাষবাস কর। এভাবে তো দিন যাবে না। বড় হয়েছিস। কিছুদিন পর বিয়েটিয়ে করবি। এখুনি কিছু একটা শুরু না করলে জীবন চলবে কী করে!
আমার কাজ করতে ভাল লাগে না।

কেন?
আমি কাজ করব কেন?
তা হলে কে করবে?
কাজ করবে চাকরবাকররা!
এ্যাঁ।
হ্যাঁ। আমি কি চাকরবাকর নাকি যে কাজ করব!
রাজু হোহো করে হাসতে লাগল।
খালা বলল, তুই একটা পাগল!
পাগলদেরও পেট থাকে।
এ্যাঁ?
হ্যাঁ। পরীকে বলো আমাকে নাশতা দিতে।
পরী কাপড় ধুতে গেছে? এখন হবে না।
তা হলে আমি কি না খেয়ে থাকব!
তোর তো খাওয়ার জায়গার অভাব নেই। অন্য কোনও বাড়িতে যা।
যেতে পারি, কিন্তু তাতে তোমার একটা ক্ষতি হবে।
কী ক্ষতি?
তোমার একটা জিনিশ আছে আমার কাছে, যদি চা-নাশতা না খাওয়াও জিনিশটা তোমাকে আমি দেব না। নিয়ে চলে যাব।
কী জিনিশ?
তা বলব না। তবে জিনিশটা পেলে খুশিতে তুমি পাগল হয়ে যাবে।
বল-না কী জিনিশ?
বলব না।
হাতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসছে খালার। সবশেষ রেকাবিটা মুছে হাতের কাছ থেকে সরিয়ে রাখলেন তিনি। তারপর চশমাটা চোখের দিকে আর একটু ঠেলে দিয়ে বললেন, চালাকি?
রাজু বলল, না, চালাকি না খালা, সত্যি! তুমি জান চালাকি জিনিশটা আমি কখনও করি না। চালাকি করলে আমার মতো ছেলের জীবন কি এমন হয়! আমার বাবা নেই। সংসারে আমি আর আমার মা। অত বড় বাড়ি আমাদের। অত জায়গাজমি। বর্গা দিয়ে ফসল যা পাই, খেয়েদেয়েও সত্তর-আশি হাজার টাকা হাতে থাকে। চালাকি করতে পারলে টাকাপয়সা জমাজমি সবই তো আমার হাতে চলে আসত। মার হাতে থাকে নাকি! সংসারে আমি যা অর্ডার করতাম তা-ই তো হত!

খালা বলল, তা ঠিক।
রাজু সঙ্গে সঙ্গে বলল, এবার তা হলে চা-নাশতার কথাটা বলো।
খালা হাসল। তুই-ই বল।
পরী কোথায়?
ওই তো উঠোনে কাপড় রোদে দিচ্ছে।
কাপড় ধুয়ে ফিরেছে?
হ্যাঁ।
রাজু গলা বাড়িয়ে উঠোনের দিকে তাকাল। তারপর চিৎকার করে পরীকে ডাকল, পরী!
পরী ঘরের দিকে তাকাল না। তারের ওপর রোদে কাপড় মেলে দিতে দিতে বলল, কী?
খালা ডাকে।
আসতেছি।
জানালা দিয়ে উঠোনের দিকে তাকালেন খালা। আসতে হবে না। তুই একটা কাজ কর পরী। রাজুর জন্যে গুড়-মুড়ি নিয়ে আয়। তারপর এক কাপ চা দিস।
পরী কথা বলল না।
খালা তারপর রাজুর দিকে তাকালেন। এবার বল।
কথাটা যেন বুঝতে পারল না রাজু। বলল, কী বলব?
বলবি মানে জিনিশটা দে।
কোন জিনিশ!
ওই যে বললি!
ও হ্যাঁ।
সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রাজু। প্যান্টের পকেটে হাত দিল। কাল সন্ধেবেলা পেয়েছি। তোমাকে যে এসে দিয়ে যাব সময় হয়নি।
ততক্ষণে পকেট থেকে বিদেশি খামের একটা চিঠি বের করেছে রাজু। বিকেলবেলা বাজারের দিকে গিয়েছিলাম, পিয়ন দিয়ে দিল। আমি বাড়ি ফিরেছি অনেক রাতে। নয়তো রাতে এসেই তোমাকে দিয়ে যেতাম।
চিঠিটা হাতে নিয়ে কীরকম উদাস হয়ে গেলেন খালা। ব্যাপারটা খেয়াল করল না রাজু। উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, আমেরিকা থেকে এতকাল পর খালেদ ভাইয়ের চিঠি এল, সামান্য নাশতার জন্যে চিঠিটা যদি তোমাকে আমি না দিতাম খালা, কীরকম ক্ষতি তোমার হত বলো তো!
খালা তবু কথা বললেন না, আগের মতোই উদাস হয়ে রইলেন।

স্কুলবাড়িটির উঠোনে বিশাল এক বকুলগাছ। কতকালের পুরনো গাছ কে জানে! বাড়িটি যখন জঙ্গুলে হয়ে পড়েছিল তখন এই গাছটির যত্ন নেয়া তো দূরের কথা, বকুল যে গাছ হিশেবে বনেদি এবং সুন্দর একথাটিই কেউ ভাবেনি। তখন অবশ্য পুরো এলাকাটিই ছিল জঙ্গুলে এবং নির্জন। মানুষের ঘরবাড়ি আজকের মতো ছিল না। চারদিকে অজস্র গাছপালা পুকুর ডোবা, ঘরবাড়ির ফাঁকফোকরে শস্যের জমি। সন্ধের পর প্রেতপুরি হয়ে যেত সম্পূর্ণ এলাকা। মাইলখানেক দূরে নদী। নদীতীরে বাজার। বাজারের ঘাট থেকে লঞ্চে চড়লে ঢাকা গিয়ে পৌছুতে বিকেল হয়ে যেত। একটি রাস্তার কারণে সেই দূরত্ব কমে এখন মাত্র ঘণ্টাখানেকের পথ। দিনে তিনবার গিয়ে তিনবার ফেরা যায় ঢাকা থেকে। লঞ্চের কারবার এখন আর নেই। এখন যাওয়ার জন্যে প্রচুর বাস মিনিবাস হয়েছে। কেউ-কেউ স্কুটার নিয়েও চলে যায়। ছুটিছাটার দিনে বউ-বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস জীপ ইত্যাদি ভরে লোকজন আসে। সারাদিন বেরিয়ে বিকেলবেলা ফিরে যায়।

এলাকার পয়সাঅলা লোক যারা ঢাকায় থাকে তারা কেউ-কেউ তাজামাছ কিনতেও চলে আসে কোনও-কোনওদিন। গাড়ি ভরতি করে মাছ কিনে ঢাকায় ফিরে যায়।

বাজারের পেছন দিককার যে-নদীর ঘাটে একদা লঞ্চ ভিড়ত সেই জায়গা এখন কক্সবাজার সী-বীচের মতো। দীর্ঘ, মাইলখানেক চওড়া চর পড়েছে। তারপর পদ্মার ঘোলাজল কিছুদূর অব্দি বিস্তৃত। তারপর আবার চর। যেটুকু জায়গায় জল আছে সেই জলে লঞ্চ স্টিমার চলতে পারে না, চলে কেবল জেলেনাও। আর বেজায় মাছ পড়ে জায়গাটায়। শয়ে শয়ে লোক মাছের কারবার করে বেঁচে আছে। ছোট্ট বাজারটি এখন বিশাল বন্দরের আকার ধরেছে। সিনেমা হল হয়েছে, কোল্ড স্টোরেজ হয়েছে, বিশাল মসজিদ হয়েছে। ফটো তোলার স্টুডিও-ভিডিও

ক্যাসেটের দোকান– কী নেই এখন হাতের কাছে! প্রত্যেক বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি, প্রত্যেক বাড়ি দিনেরাতে সমান আলোকিত। নির্জন গ্রামের গাছপালা-ঘেরা ছাড়াবাড়িগুলোর কোনওটায় হয়েছে প্রাইমারি স্কুল, কোনওটায় বাচ্চাদের কিন্ডারগার্টেন, কোনওটায় মাদ্রাসা।

দীর্ঘকাল ছাড়া পড়ে থাকা চৌধুরীদের বিশাল বাড়িটির এক অংশে হয়েছে বাচ্চাদের কিন্ডারগার্টেন স্কুল। ফলে ওই অংশটি চৌধুরীবাড়ির সীমানার মধ্যে থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা একটি বাড়ি হয়ে উঠেছে। একপাশে লম্বা ধরনের একতলা বিল্ডিংটায় স্কুল। উঠোনের মাঝখানে বকুলগাছ। বকুলগাছটির চারদিকে মাটি তুলে বেশ খানিকটা উঁচু করা হয়েছে। তারপর ইট গেঁথে সুন্দর একটা চত্বর তৈরি করা হয়েছে। ছোট ছেলেমেয়েকে স্কুলঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে মা খালা বড় বোন কিংবা ফুপু কিংবা বাড়ির কাজের মেয়েরা বকুলতলার চত্বরটায় বসে অপেক্ষা করে। কখন ছুটি হবে, কখন বাচ্চা নিয়ে বাড়ি ফিরবে তারা।

স্কুলবাড়িটির চারদিক ঝকঝকে তকতকে এখন। শুধু স্কুলবাড়িটিই-বা কেন, পুরো এলাকাটিই তো ঝকঝকে তকতকে হয়ে গেছে। গাছপালা জঙ্গল ইত্যাদি কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। দিনেরবেলাও যেসব গাছপালা এবং ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকত নির্জনতা, রহস্যময়তা, কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে সেসব। শহরের ছোঁয়া লেগে গেছে এলাকায়। মানুষ যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে। নতুন করে বাঁচতে শুরু করেছে।

স্কুলবাড়ির বকুলতলার চত্বরে বসে হাসি কি আজ এসব ভাবছিল? নাকি অন্যকিছু।

হাসির পাশে বসে আছে নীলুভাবি। এলাকার সাবরেজিস্ট্রারের বউ। মহাসড়কের ওপাশে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে। পাবনার লোক। বছর তিনেক হল এখানে এসেছে। ভদ্রমহিলার বয়স হাসির মতোই। মোটাগাটা। গায়ের রঙ ফরসা। তবে খুবই আমুদে ধরনের মহিলা। খুবই হাসিখুশি। দুমিনিটে যে-কারু সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলে। হাসির সঙ্গে মুখচেনা একটা পরিচয় তার ছিল। আজ বকুলতলায় পাশাপাশি বসে সেই পরিচয়কে পাকাপোক্ত করে ফেলল নীলুভাবি। ঘনঘন পান খাওয়ার অভ্যেস তার। ভ্যানিটি-ব্যাগে পান রাখে। সঙ্গে সুগন্ধি মশলা। কথা বলার সময় মুখ থেকে সুন্দর একটা গন্ধ আসে তার।

নীলুভাবি হাসির সঙ্গে কথা শুরু করল পান নিয়ে। ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে পান বের করে মুখে দেয়ার আগে বলল, হাসিআপা, পান খাবেন?

হাসি একটু আনমনা ছিল। নীলুভাবির কথায় চমকে উঠল। তারপর হাসল।

আপনি এলেন কখন?
নীলুভাবি হাসল। এই তো এখুনি এলাম।
আশ্চর্য ব্যাপার, টের পেলাম না!
কী করে পাবেন! আপনি তো খুব আনমনা ছিলেন। আপনার চোখের ওপর দিয়ে এত জায়গা হেঁটে এলাম, এসে আপনার পাশে বসলাম, ব্যাগ খুলে পান বের করলাম, তবু দেখি আপনি তাকান না!
আমি এরকমই।
কীরকম?
কখনও কখনও এমন আনমনা হই, চোখের সামনে কত কী ঘটে যায় দেখতেই পাই না।
আপনার বয়সি মেয়েদের তো এমন হওয়ার কথা না!
বয়সের সঙ্গে আনমনা হওয়ার সম্পর্ক কী?
নীলুভাবি হাসল। সম্পর্ক আছে।
কী?
বলছি। তার আগে বলুন, পান খাবেন?
না।
কেন?
আমি পান খাই না।
কখনও খান না?
না।
বলেন কী?
হ্যাঁ।
ভাতটাত খাওয়ার পরেও না?
না।
আমি খাই। পান ছাড়া আমি থাকতে পারি না।
নীলুভাবি পান মুখে দিল। সেই ফাঁকে হাসি দেখতে পেল নীলুভাবির দাঁত খুব সুন্দর। দেখে অবাক হল হাসি। যারা রেগুলার পান খায় তাদের দাঁত তো এত সুন্দর হয় না!
হাসি বলল, আপনি কতদিন ধরে পান খান ভাবি?
নীলুভাবি হাসল। বিয়ের বছরখানেক পর থেকেই।
আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন?

সতেরো বছর।
তাই নাকি!
হ্যাঁ। কেন, বোঝা যায় না?
হাসি কথা বলল না।
নীলুভাবি বলল, আমার বড় ছেলে যে এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে আমাকে দেখে অনেকেই তা বিশ্বাস করে না। বললে ভাবে ফাজলামো করছি।
তা হলে ছেলের কথা বলবেন না। শুধু মেয়েটির কথা বলবেন।
নীলুভাবি খিলখিল করে হেসে উঠল। ছেলের বয়স ষোলো, মেয়ের সাত। আশ্চর্য ব্যাপার না?
হ্যাঁ। গ্যাপটা খুব বেশি।
ছেলে হওয়ার পর আমি তো বাচ্চা আর নিতেই চাইনি।
তা হলে নিলেন কেন?
সাহেবের বাড়াবাড়ির জন্যে।
আপনার সাহেব বুঝি মেয়ে খুব পছন্দ করেন?
হ্যাঁ। মেয়ে তার জান। কিন্তু মেয়েটি যখন হল তখন তাঁর মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। বয়সের তুলনায় আমার তেমন চেঞ্জ হয়নি। কিন্তু ভদ্রলোক টাকফাক পড়ে বুড্ডা হয়ে গেছেন। আপনি আমার ভদ্রলোককে দেখেননি?
না।
আমার পাশে দাঁড়ালে মনেই হয় না আমার ভদ্রলোক। বাবা-মেয়ে মনে হয়।
এই কথাটি শুনে হেসে ফেলল হাসি। নীলুভাবিও হাসল। তারপর বলল, আপনার ফিগারও দারুণ সুন্দর। কী করে রাখলেন?
হাসি আবার হাসল। আমার ফিগার সুন্দর নাকি?
হ্যাঁ। দারুণ সুন্দর! বিয়েটিয়ে করেননি? এই বয়সে ফিগার তো এত সুন্দর থাকার কথা নয়। হাসিআপা, আপনি কি ব্যায়াম করেন?
আরে ধুৎ।
তা হলে?
কিছুই করি না।
ডায়েট কন্ট্রোল?
না।
তা হলে?
আমি তিনবেলা ভাত খাই জানেন।

তাই নাকি?
হ্যাঁ।
আশ্চর্য ব্যাপার! তিনবেলা ভাত খেয়ে এই বয়সে এত সুন্দর ফিগার!
এটা আমাদের বংশের ধারা। আমার ভাই আমারচে চার বছরের বড়। ওই টুপুর বাবা। তাকে দেখলে তো আপনি অবাক হয়ে যাবেন। দেখলে মনে হবে এখনও বিয়ে করেনি।
আপনার বয়স কত হাসিআপা?
প্রশ্ন শুনে হাসল হাসি। চালাকি না সত্যি কথা বলব।
সত্যিটাই বলুন।
আপনি বিশ্বেস করবেন?
করব।
ছত্রিশ।
বলেন কী?
হ্যাঁ। টুপুর বাবার চল্লিশ।
আপনাকে কিন্তু এতটা মনে হয় না।
কী মনে হয়?
তিরিশ টিরিশ মনে হয়।
তা হলে তো টুপুর বাবাকে দেখে আপনার মনে হবে সে আমার ছোট ভাই।
টুপুর বাবা থাকেন কোথায়? আমি তো তা হলে তাঁকে দেখিনি। ঢাকায় থাকেন নাকি? মেয়ে দেখতে গ্রামে কখনও আসেন না?
ভাইয়ের কথা উঠতেই কীরকম একটু উদাস হয়ে গেছে হাসি। উদাস আনমনা গলায় বলল, না, ঢাকায় থাকেন না। থাকেন আমেরিকায়।
তাই নাকি?
হ্যাঁ।
কতদিন হল?
ছবছর।
টুপুর বয়স কত?
আগামী মাসে সাত হবে।
টুপুর মা মারা গেছেন কবে?
কথা শুনে হাসি বেশ অবাক হল। টুপুর মা যে মারা গেছেন আপনি জানলেন কী করে?

শুনেছি।
কার কাছে?
রাজু বলেছে। রাজু তো প্রায় যায় আমার কাছে। আপনাদের কথা যেটুকু শোনার রাজুর কাছেই শুনেছি।
আমার ভাইয়া মানে টুপুর বাবা যে আমেরিকায় থাকে রাজু এটা বলেনি?
না।
টুপুর মা কবে মারা গেছে তাও বলেনি?
মারা গেছে এটা বলেছে, কবে মারা গেছে বলেনি। কথাটা একদিন উঠেছিল। উঠে অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছিল। পুরোটা বলতে পারেনি রাজু।
আমার ভাবি মারা গেছেন টুপুর চার মাস বয়সে।
টুপু তারপর থেকে আপনার কাছে?
হ্যাঁ। ভাবি মারা যাওয়ার পর ভাইয়া একটু অ্যাবনরম্যাল হয়ে গিয়েছিল। মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাত না। ওই অতটুকু মেয়ে ফেলে আমেরিকায় চলে গেল।
আর আসেননি?
না।
চিঠিপত্র?
বছরে একআধটা।
মেয়ের খোঁজ খবর নেন না?
চিঠি লিখলে জানতে চায়– ওইটুকু।
আমেরিকায় কী করেন ভদ্রলোক?
বিজনেস।
তাই নাকি?
হ্যাঁ। রেস্টুরেন্ট করেছে।
আর বিয়েটিয়ে করেননি?
করেছে।
তাই নাকি?
হ্যাঁ।
আমেরিকান মেয়ে?
না, বাঙালিই। তবে মেয়েটি জন্মেছে আমেরিকায়। বাংলাদেশে কখনও আসেনি।
টুপুর কথা তো জানে?
জানি না।

আপনাদের সংসার তাহলে চলে কী করে?
কথাটা যেন বুঝতে পারল না হাসি। ভাইয়া এবং টুপুর কথা বলতে বলতে কীরকম যেন আনমনা হয়ে গিয়েছিল। বলল, জি?
আপনাদের সংসার কি আপনার চাকরির টাকায় চলে?
না, শুধু চাকরির টাকায় চলে নাকি! আমি আর কটাকা মাইনে পাই!
তা হলে?
জমিটমি আছে আমাদের। বছরের ধান চাল জমি থেকেই আসে।
তারপর হঠাৎ করেই সম্পূর্ণ অন্য একটি প্রশ্ন করল নীলুভাবি। আপনি বিয়ে করেননি কেন হাসিআপা?
প্রশ্নটি শুনে থতমত খেয়ে গেল হাসি। তারপর মৃদু হেসে বলল, করা হয়নি।
কেন?
বোধহয় ভাগ্যে ছিল না।
আপনি তো ইচ্ছে করলে এখনও বিয়ে করতে পারেন। আপনার যা ফিগার যা চেহারা!
হাসি আবার হাসল। ইচ্ছে নেই।
কেন?
এমনি। সব মানুষের জীবনে তো সবকিছু হয় না।
তবু আপনার মতো এত সুন্দর একটি মেয়ে।
আমার কথা বাদ দিন। আপনার কথা বলুন।
আমার কী কথা?
আপনি পান খান পনেরো-ষোলো বছর ধরে?
হ্যাঁ।
কিন্তু আপনার দাঁত দেখে তা বোঝা যায় না।
নীলুভাবি খুবই অবাক হল। কী করে বোঝা যাবে।
মানে?
আমি তো বছরে একবার করে ঢাকায় বড় একজন ডেনটিস্টের কাছে যাই।
কেন?
দাঁত পরিষ্কার করাতে।
তাই নাকি?
হ্যাঁ।
পানের জন্যে এত কষ্ট!

নীলুভাবি আবার হাসে। নেশার জন্যে মানুষ কী না করে।
তা ঠিক।
অবশ্য দাঁত নিয়ে আমার অত মাথাব্যথা ছিল না। পান খেয়ে দাঁত কালো হয়ে গেলে কী যায় আসে বলুন। বয়স হয়ে গেছে। ছেলে এসএসসি পরীক্ষা দেবে।
তা হলে ডেনটিস্টের কাছে যান কেন?
যাই সাহেবের জন্যে।
মানে?
আমার দাঁত নাকি সাহেবের খুব পছন্দ। এই দাঁত দেখেই নাকি আমাকে তাঁর পছন্দ হয়েছিল। যে-দাঁত দেখে আমাকে তিনি পছন্দ করেছিলেন সেই দাঁত পান খেয়ে নষ্ট করে রাখি আমি, এটা সাহেব সহ্য করতে চান না। বছরে একবার নিজেই ডেনটিস্টের কাছে নিয়ে যান।
নীলুভাবির কথা শুনতে শুনতে আবার আনমনা হয়ে গিয়েছিল হাসি। দেখে নীলুভাবি বলল, বিয়ে হলে এই এক সমস্যা আপা।
হাসি নীলুভাবির মুখের দিকে তাকাল। কী সমস্যা?
স্বামীর মন জুগিয়ে চলতে হয়।
বিয়ে না করেও তো কত মানুষের মন জুগিয়ে চলতে হয়!
তা ঠিক। মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়স্বজন কত মানুষের মন জুগিয়েই তো চলতে হয় মানুষের!
তখন যেন হঠাৎ করে কথাটা মনে পড়ল হাসির। বলল, আপনি আমাকে বলছিলেন না এই বয়সে এতটা আনমনা হওয়া মানায় না আমাকে?
হ্যাঁ।
কী ভেবে বলেছিলেন?
তেমন কিছু ভেবে না।
তবু কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন আপনি।
ও, মনে পড়েছে।
কী?
বলতে চেয়েছিলাম অল্প বয়সে প্রথম প্রেমে পড়লে মেয়েরা যেমন আনমনা হয়ে থাকে, চোখের সামনে ঘটে যাওয়া অনেক কিছুই দেখতে পায় না, আপনার অবস্থা হয়েছে তেমন। বলতে চেয়েছিলাম এই বয়সে আপনি আবার প্রেমে পড়লেন নাকি।
নীলুভাবি হাসতে লাগলেন। কিন্তু হাসি হাসল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, প্রেম!

নীলুভাবি তারপর বলল, টুপুকে কি এই স্কুলেই রাখবেন?
হাসি বলল, এই বছরটা রাখব।
তারপর?
আমার স্কুলে নিয়ে যাব।
হ্যাঁ। ভাইয়ের মেয়ে হয়েও সে তো এখন আপনারই মেয়ে।
টুপু যে আমার মেয়ে নয়, আমার ভাইয়ের মেয়ে, এই কথাটা আমার অবশ্য আজকাল আর মনেই থাকে না। ভাবতেই পারি না টুপু আমার নয়, অন্য কারু। আমার জীবনের যা-কিছু পরিকল্পনা এখন তার পুরোটাই টুপুকে নিয়ে। মার বয়স হয়ে গেছে। যখন-তখন মারা যাবে। আমার তো জীবন কাটাতে হবে টুপুকে নিয়েই।
কিন্তু টুপু যখন বড় হবে, তার যখন বিয়ে-টিয়ে হয়ে যাবে?
তখন যে কী হবে, টুপুকে ছেড়ে যে কেমন করে থাকব আমি ভাবতেই পারি না!
ঠিক তখুনি ছুটি হল স্কুল। অন্যান্য বাচ্চার সঙ্গে ব্যাগ-কাঁধে ছুটতে ছুটতে বেরুল টুপু। বেরিয়ে পাগলের মতো ছুটে এল হাসির কাছে। ফুপি, ও ফুপি! আমার ছুটি হয়ে গেছে।
টুপুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে হাসি। টুপু কাছাকাছি আসতেই মাথাটা টুপুর দিকে ঝুঁকিয়ে দিল সে। দুহাতে হাসির গলা জড়িয়ে ধরল টুপু।

মা বলল, খালেদের চিঠি এসেছে।
কথাটা শুনে চমকে উঠল হাসি। টুপুকে ভাত খাওয়াতে বসিয়েছে। স্কুলে যাওয়ার আগে সকালবেলা শুধু একগ্লাস দুধ খেয়ে যায় টুপু। ফিরে এসে ভাত খায়।
কিন্তু টুপু যখন ফেরে হাসি তখন বাড়ি থাকে না। সে চলে যায় স্কুলে। টুপুর সঙ্গে তার দেখা হয় বিকেলবেলা। অবশ্য সকালবেলা টুপু যখন স্কুলে যায়, টুপুর কাপড়চোপড় পরিয়ে দেয় হাসি নিজে। টুপু ঘুমোয় তার সঙ্গে। সকালবেলা হাসিই ডেকে তোলে টুপুকে। তারপর অতটুকু মেয়ের সকালবেলার যা-কিছু কাজ

সবই করে দেয় হাসি। হাতমুখ ধুইয়ে, জামাকাপড় পরিয়ে, বইয়ের ব্যাগ গুছিয়ে পুরো একগ্লাস দুধ খাইয়ে দেয় টুপুকে। তারপর পরীর হাত ধরে স্কুলে চলে যায় টুপু। সাড়ে দশটার দিকে স্কুল থেকে ফিরে আসে। ফিরে আসার পর ভাতটা টুপুকে পরী খাইয়ে দেয়। আজ সেই কাজটা করছে হাসি। কারণ হাসি বাড়ি থাকলে অন্য কারু হাতে কিছুতেই খেতে চায় না টুপু। ঘ্যানঘ্যান করে। কান্নাকাটি করে।

তবে টুপুকে ভাত খাওয়ানো এক ভয়ংকর কাজ। যেটুকু ভাত সাধারণত খায় সে, সেটুকু ভাত খাওয়াতে তাকে সময় লাগে ঘণ্টাখানেক। ভাত মেখে ছোট ছোট ডেলা করে রাখতে হয় প্লেটে। একটা ডেলা মুখে দেয় টুপু। কিন্তু তখুনি গেলে না। এমনকি চিবায়ও না। মুখের ভেতর রেখে দেয়। রেখে দিয়ে অন্যত্র ব্যস্ত হয়ে যায়। ভাত খাওয়াতে বসে টুপুর যাবতীয় খেলনা রাখতে হয় তার হাতের কাছে। পশমি কাপড়ে তৈরি খয়েরি রঙের বিশাল একটা কুকুর আছে টুপুর। একই কাপড়ে তৈরি শাদা রঙের একটা পুতুল আছে। প্লাস্টিকের তৈরি হাঁড়িপাতিল আছে, তিনচাকার একটা সাইকেল আছে, সবগুলো জিনিশই তখন টুপুর চারপাশে। টুপু এটা নাড়ে, ওটা নাড়ে। কখনও পুতুলটা চেপে ধরে রাখে বুকের কাছে, কখনও রাখে কুকুরটা। মুখে ভাত, তবু ফিসফিস করে কথা বলে পুতুল কিংবা কুকুরের সঙ্গে। কখনও কখনও ভাত মুখে রেখে প্লাস্টিকের হাঁড়িপাতিলে রান্না করতে বসে যায়। উঠোনের কোণে আছে একটা হাসনুহানা ঝোপ। সেই ঝোপ থেকে হাসনুহানার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে আসে। হাসনুহানার ছোট ছোট পাতাগুলোকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে হাঁড়িপাতিলে ভাত রান্না করতে বসে। অন্য কোনওদিকে তখন মনোযোগ থাকে না টুপুর। মুখে যে ভাতের ডেলা আছে, সেটা যে খেতে হবে, টুপুর মনে থাকে না। পালঙ্কের কোণে প্লেটে ভাতের ডেলা সাজিয়ে যে বসে আছে পরী কিংবা হাসিফুপি, টুপুর মনে থাকে না। খেলনা হাঁড়িপাতিলে হাসনুহানার পাতাকে ভাতের মতো করে রান্না করে যায়। টুপুর ভাবটা তখন পাকা গৃহিণীর মতো।

কখনও কখনও ভাত মুখে নিয়ে উঠোনে সাইকেল চালাতে চলে যায় টুপু। শাঁ শাঁ করে সাইকেল নিয়ে চক্কর খায়। পরী কিংবা হাসি যে-ই তাকে ভাত খাওয়ায়, তার সেদিন ভাতের প্লেট-হাতে উঠোনে টুপুর সাইকেলের পিছুপিছু ঘুরতে হয়। আজ স্কুল থেকে ফিরেই সাইকেল নিয়ে পড়েছে টুপু। হাসি তার ভাত রেডি করে মাত্র প্রথম ডেলাটা মুখে দিয়েছে, ভাতের ডেলা মুখে দিয়েই সাইকেল নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে গেছে টুপু। হাসি মাত্র ছুটে যাবে তার পেছনে, তক্ষুনি কথাটা বলল মা। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল হাসি। এ্যাঁ।

মা বলল, হ্যাঁ।

কখন এসেছে?

কাল সন্ধ্যায়।

তুমি যে আমাকে বললে না!

আমি পেয়েছি তুই টুপুর স্কুলে যাওয়ার পর।

সকালবেলা পিয়ন এল?

না, পিয়ন আসেনি।

তা হলে?

পিয়ন নাকি কাল সন্ধ্যায়ই রাজুকে দিয়েছিল চিঠিটা।

রাজু তাহলে দিয়ে যায়নি কেন?

ও নাকি অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছে।

ও।

তারপর একটু থেমে হাসি বলল, কী লিখেছে ভাইয়া?

মা গম্ভীর গলায় বলল, জানি না।

মানে?

চিঠি আমি পড়িনি।

কেন?

এমনি।

আরে! ছেলের ওপর অভিমান মানুষের থাকতে পারে, তাই বলে অতদূর থেকে চিঠি আসবে, তার সেই চিঠি পড়বে না, খুলেও দেখবে না– এটা তো ঠিক না মা!

আমার কোনও অভিমান নেই। তোদের কারু ওপর আমার কোনও অভিমান নেই।

হাসি বুঝে গেল অভিমানের কথা অস্বীকার করেও অভিমানের কথাই বলছেন মা। মার স্বভাব এইরকমই। ইচ্ছে করলে বিষয়টা নিয়ে হাসি এখন অনেক কথা বলতে পারে। কিন্তু বলল না। সে মিষ্টি করে হাসল। চিঠিটা কোথায় মা?

মা বলল, আমার বালিশের তলায় আছে।

বের করে দাও, পড়ি।

তুই নিজেই বের করে নে।

মা বসে আছেন পালঙ্কের ওপর। এতক্ষণ হাসির দিকে মুখ করে কথা বলছিলেন। এবার জানালার দিকে মুখ ফেরালেন। মুখটা গম্ভীর হয়ে আছে তাঁর। মার মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল হাসি। তারপর বালিশের তলা থেকে চিঠিটা বের করল। ডানহাতে টুপুর জন্যে ভাত মেখেছিল, হাতে এখনও লেগে আছে ভাত তরকারি। চিঠি খোলার আগে হাতটা যে ধোবে কথাটা একবারও মনে হল না তার, ডানহাতের উলটোপিঠে চিঠিটা চেপে ধরে বাঁহাতে মুখ খুলে চিঠিটা বের করল। তারপর পড়তে লাগল।

চিঠিটা ভাইয়া মাকেই লিখেছে। ছোট্ট চিঠি। মুহূর্তেই পড়া হয়ে গেল। এবং চিঠি পড়েই চিৎকার করে উঠল হাসি। মা, ওমা, ভাইয়া আসছে তো! সঙ্গে সঙ্গে হাসির দিকে মুখ ঘোরালেন মা, মুহূর্তে অভিমান কোথায় হাওয়া হয়ে গেল তাঁর। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল। এ্যাঁ।

হ্যাঁ, ভাইয়া আসছে তো!

কবে?

তিন তারিখে ফ্লাই করবে। পাঁচ তারিখে আসবে ঢাকায়। ছ তারিখে বাড়ি।

সত্যি?

সত্যি। আরে এই যে দ্যাখো।

থাবা দিয়ে হাসির হাত থেকে চিঠিটা নিলেন মা। নিয়ে পড়তে লাগলেন।

হাসির উচ্ছ্বসিত গলা উঠোন থেকে শুনতে পেয়েছিল টুপু। শুনে অবাক হয়ে সাইকেল থামিয়েছে সে। ভাতের ডেলা তখনও মুখে। ভাতটা মুহূর্তে গিলে ফেলল সে। তারপর ছুটে এল হাসির কাছে। কী হয়েছে ফুপি?

আনন্দে তখন যেন ফেটে পড়ছে হাসি। টুপুর কথা শুনে টুপুর নাকটা টিপে ধরল হাসি। তোর আব্বু আসবে।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না টুপু। বলল, কে?

তোর আব্বু।

যাহ্!

হ্যাঁ, সত্যি।

টুপু ঠোঁট উলটে বলল, আসুক গে!

তারপর হাঁ করল। ভাত দাও।

প্লেট থেকে এক ডেলা ভাত তুলে টুপুর মুখে গুঁজে দিল হাসি। ভাত মুখে নিয়ে দৌড়ে উঠোনে চলে গেল টুপু। গিয়ে সাইকেলে চড়ে বসল।

মশারির ভেতর ঢুকেই টুপুর দিকে তাকাল হাসি। টুপু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। বোধহয় ঘুমিয়ে গেছে। রাত তো বেশ হয়েছে। টুপুর এতক্ষণে ঘুমিয়ে যাওয়ার কথা।

হাসি তারপর যত্ন করে মশারি গুঁজল। বেড-সুইচ টিপে লাইট অফ করল। তারপর শুয়ে পড়ল।

বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে হাসির। প্রতিরাতেই পড়ে। অভ্যেস। আজও দীর্ঘশ্বাসটা পড়ল হাসির। ঠিক তখুনি হাসির দিকে পাশ ফিরল টুপু। একটা হাত হাসির গলার ওপর দিয়ে বলল। ফুপি।

টুপুর কথায় চমকে উঠল হাসি। একী! ঘুমোসনি তুই?

টুপু আদুরে গলায় বলল, না।

কেন?

ঘুম আসছে না।

ঘুম আসছে না কেন?

তুমি পাশে এসে না শুলে যে আমার ঘুম আসে না! তুমি এত দেরি করে শুতে এলে কেন?

আমি তোমার দাদুর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

কী কথা?

তোমার আব্বু আসবে তো, ওই নিয়ে তোমার দাদু আর আমি কথা বলছিলাম।

আব্বু আসবে কেন?

বাহ্, আসবে না!

কেন আসবে?

তোমাকে দেখতে আসবে।

যাহ্!

হ্যাঁ।
সত্যি?
সত্যি।
আমাকে দেখতে কেন আসবে?
তুমি যে তার মেয়ে।
মেয়ে হলে বুঝি দেখতে আসতে হয়?
হ্যাঁ।
তা হলে আগে কোনওদিন আসেনি কেন?
টুপুর এই প্রশ্নে বেশ একটু থতমত খেল হাসি। অন্ধকার বিছানায় কেউ কারু মুখ দেখতে পাচ্ছে না। দুজন মুখোমুখি হয়ে শুয়েছে। হাসির গলার ওপর একটা হাত দিয়ে তার বুকের কাছে মুখ গুঁজে রেখেছে টুপু। এটা তার অভ্যেস। এভাবে ফুপুর গলা জড়িয়ে না ধরলে ঘুম আসে না তার।
টুপুর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হাসি বলল, আগে কোনওদিন দেশে আসার সময় পায়নি তোমার আব্বু।
টুপু বলল, কেন?
আমেরিকায় থাকলে দেশে আসার একদম সময় পায় না লোকে।
তা হলে এখন সময় পাচ্ছে কী করে?
এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে হাসি! শিশুরা কখনও কখনও এমন সব সরল অথচ ভয়াবহ জটিল প্রশ্ন করে যেসব প্রশ্নের সত্য জবাব শিশুদের বোঝার মতো করে দেয়া ভয়ংকর কঠিন কাজ।
টুপুর প্রশ্নটির জবাব দিতে পারল না হাসি। চুপ করে রইল।
টুপু বলল, আমার আব্বু একাই আসবে বুঝি?
হাসি বলল, না।
তা হলে?
তোমার আম্মুও আসবে।
যাহ্!
হ্যাঁ।
আমার আম্মু আসবে কী করে?
কেন? তোমার আব্বুর সঙ্গে আসবে।
মরে গেলে মানুষ বুঝি আর ফিরে আসতে পারে!
টুপুর এই প্রশ্নে আবার থতমত খেল হাসি। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল,

এ তো তোমার সেই মা নয়।
তা হলে কোন মা?
আমেরিকায় তোমার আর একটি মা আছে।
যাহ্!
হ্যাঁ।
সত্যি?
সত্যি।
মানুষের কটি মা হয়?
এক মা মরে গেলে আর একটি নতুন মা হয় মানুষের।
তাই নাকি?
হ্যাঁ।
তা হলে আমেরিকার মা-টি আমার তেমন মা।
হ্যাঁ।
আচ্ছা।
তোমার এই মা আগের মায়ের চেয়ে অনেক ভাল।
সত্যি?
সত্যি। অনেক ভাল, অনেক সুন্দর।
আমাকে খুব আদর করবে?
হ্যাঁ। তোকে খুব আদর করবে।
তোমার মতো আদর করবে আমাকে?
হাসি হাসল। আমার চে বেশি আদর করবে।
যাহ্!
হ্যাঁ।
তোমার চে বেশি আদর কেমন করে করবে?
কেন?
আমি তার কাছে গেলে তো!
যাবি না কেন?
আমি তোমাকে ছাড়া কারু কাছে যাব না।
কেন?
আমার ভাল লাগে না।
আম্মুর কাছে না গেলি আব্বুর কাছে যাবি তো?

তাও যাব না।
কেন?
আব্বুকে আমার ভাল লাগে না।
বলিস কী!
হ্যাঁ।
মেয়েরা বুঝি তার আব্বুর কাছে যায় না?
আমি যাব না।
কেন?
আমার ভাল্লাগে না।
তা হলে তোর কীভাল্লাগে?
আমার ভাল লাগে তোমাকে আর দাদুকে। তোমাদের দুজন ছাড়া আমি কারু কাছে যাব না।
কিন্তু আব্বু তো তোর জন্যে অনেক কিছু নিয়ে আসবে।
কী নিয়ে আসবে?
অনেক খেলনা, অনেক জামাকাপড়।
আম্মু কী আনবে?
সেও অনেক খেলনা অনেক জামাকাপড় আনবে।
আমি নেব না।
কেন?
আমার কত খেলনা আছে, কত জামাকাপড় আছে। ঈদের সময়, জন্মদিনের সময় তুমি আমাকে কত জামা কিনে দাও। কত খেলনা কিনে দাও। ওদেরটা আমি নেব না।
হাসি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
টুপু ডাকল, ফুপি!
কী?
একটা গল্প বলো।
আজ গল্প বলতে ভাল লাগছে না মা।
কেন?
এমনি।
গল্প না বললে যে আমার ঘুম আসবে না।
এখন থেকে গল্প না শুনে ঘুমোবার চেষ্টা করতে হবে।

কেন?

রোজ রোজ এত গল্প আমি কোত্থেকে শোনাব!

পুরনোগুলো শোনাবে। তুমি তো অনেক গল্প জান। রোজ একটা করে বলবে। যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার প্রথম থেকে বলবে।

টুপুর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল হাসি। এক হাতে টুপুকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরল। ওরে দুষ্টু মেয়ে, এত চালাক হয়েছ তুমি!

টুপু খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসি বলল, আজ গল্প শোনবার দরকার নেই। আয় আজ আমরা অন্য কথা বলি।

কী কথা?

তোর আব্বু-আম্মুর কথা।

না, আমি শুনব না।

কেন?

আব্বু-আম্মুর কথা শুনতে আমার ভাল্লাগে না।

শোন, দেখবি ভাল লাগবে।

আচ্ছা বলো।

তারপর হাসি কথা বলবার আগেই টুপু বলল, আমার আব্বু-আম্মু কি এই বাড়িতে এসে থাকবে?

হ্যাঁ?

কোন ঘরে থাকবে?

আমাদের পাটাতন-করা ঘরে।

সবসময় থাকবে?

সবসময় থাকবে কেন?

তা হলে?

কিছুদিন থেকে চলে যাবে।

কোথায় চলে যাবে?

আমেরিকায়।

আবার আমেরিকায় চলে যাবে?

হ্যাঁ।

টুপু চুপ করে রইল।

হাসি বলল, আব্বু-আম্মু চলে যাওয়ার সময় তোকে যদি নিয়ে যেতে চায়?

কোথায়?
আমেরিকায়।
যাহ্!
হ্যাঁ। নিয়ে যেতে চাইলে তুই যাবি না?
না।
কেন?
আমি কিছুতেই যাব না। কোনওদিনও যাব না।
কেন?
তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। কোনওদিনও যাব না।
টুপুর কথা শুনে বুকের ভেতর কেমন যে করে উঠল হাসির! বলল, তোকে যদি জোর করে ধরে নিয়ে যায়?
টুপু অবাক গলায় বলল, কী করে নিয়ে যাবে! তুমি আছ না!
আমি কী করব?
তুমি আমাকে জোর করে রেখে দেবে।
টুপুর একথা শুনে জলে চোখ ভরে এল হাসির। দুহাতে টুপুকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরল সে। কিন্তু কথা বলতে পারল না। টুপু কী বুঝল কে জানে, সেও কোনও কথা বলল না। চুপ করে রইল।
খানিক পর টুপু ডাকল, ফুপি!
নিজেকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে হাসি। বলল, কী?
আমাকে তুমি কিছুতেই যেতে দেবে না। একবার চলে গেলে আমি কিন্তু আর ফিরে আসব না।
সঙ্গে সঙ্গে হাসির মনে পড়ল আরেকজন মানুষের কথা। টুপুর মতোই প্রিয় আরেকজন মানুষ। সেই মানুষটিও তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল একদিন। আর ফিরে আসেনি। কোনও কোনও প্রিয়জন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। এক প্রিয়জন হারিয়েছে হাসি, আরেকজনকে হারাতে চায় না।
টুপুর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হাসি বলল, না, আমি তোকে যেতে দেব না। আমি তোকে কিছুতেই যেতে দেব না। আমার বুকের সঙ্গে সারাজীবন জড়িয়ে ধরে রাখব তোকে। তুই চলে গেলে আমার বুক খালি হয়ে যাবে। খালি বুক নিয়ে কেমন করে বেঁচে থাকব আমি!

কোনও কোনও সকালে একটু শক্ত ধরনের গরম-গরম আটার রুটি চায়ে ভিজিয়ে খাওয়ার সাধ হয় রাজুর। আজও হয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই রাজু চিৎকার করে তার মাকে বলেছে, মা, গরম-গরম আটার রুটি আর চা খাব। চা বানাবে বেশি করে। পুরো এক মগ চা লাগবে আমার।

মা কোনও কথা বলেননি। রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। আর রাজু গেছে তার সকালবেলার কর্ম সারতে।

রাজুদের বারবাড়ির কাছে একটা চাপকল আছে। হাতমুখ ধোয়ার কাজটা সকালবেলা সাধারণত পুকুরঘাটে গিয়ে সারে না রাজু। বারবাড়ির কাছের চাপকল থেকেই সেরে নেয়। একহাতের তালুতে চাপকলের মুখটা চেপে ধরে অন্যহাতে চাপকলের হ্যান্ডেলে পরপর চার-পাঁচটা চাপ দেয়। ফলে জল উঠে কলের ভেতরকার ফাঁকা জায়গাটা সম্পূর্ণ ভরে যায়। তারপর চেপে রাখা হাতটা সামান্য ফাঁক করে জল বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে রাজু। সেই জলে কায়দা করে হাতমুখ ধোয়।

আজও এইভাবেই ধুয়েছে হাতমুখ। তারপর রান্নাঘরে এসে ঢুকেছে।

মা ততক্ষণে আটা ছেনে আট-দশখানা রুটি তৈরি করে ফেলেছেন। রাজুর দেরি দেখে রুটি ভাজা শুরু করেননি। মাটির জোড়া চুলোর একটায় বসানো আছে তাওয়া, অন্যটায় দুধ চিনি চাপাতা জল একত্রে মিশিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের কেটলিতে বসানো হয়েছে। কেটলির মুখ বন্ধ, কিন্তু চা যে টগবগ করে ফুটছে বোঝা যায়। মিহিন একটা শব্দ হচ্ছে। কেটলির নলে শক্ত করে গুঁজে রাখা হয়েছে কাপড়ের টুকরো। নল দিয়ে বাষ্পটা যাতে না বেরুতে পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা। রুটিগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে কুলোয়। একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে।

রান্নাঘরে ঢুকেই এক পলকে সব দেখে নিল রাজু। তারপর পিঁড়ি টেনে পা ভাঁজ করে বসল। আরামের একটা শব্দ করে বলল, রুটি ভাজো মা।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত তাওয়ায় একটা রুটি তুলে দিলেন মা। তারপর ন্যাকড়া দিয়ে ধরে চায়ের কেটলিটা নামালেন। ভারী ধরনের একটা মগে চা ঢালতে লাগলেন মা। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের অদ্ভুত গন্ধে ঘর ভরে গেল। সেই গন্ধ নাকে টেনে উৎফুল্ল হয়ে গেল রাজু। মুখটা হাসিহাসি করে বলল, বাহ্ ভারি খুশবু ছুটিয়াছে।

প্রথম রুটিটা ভাজা হয়ে গেছে ততক্ষণে। রুটিটা নামিয়ে রাজুর হাতের কাছে কুলোর একপাশে রাখলেন মা। রাজু আর দেরি করল না। রুটিটা গোল করে পেঁচিয়ে চায়ে চুবিয়ে চুবিয়ে খেতে লাগল।

দুতিনটে রুটি খাওয়ার পর রাজুর হঠাৎ করে মনে হল ঘুম ভাঙার পর এই যে এতটা সময় কেটে গেছে, কিন্তু মা তার সঙ্গে একটিও কথা বলেননি। কেন বলেননি? কী ব্যাপার?

চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল রাজু। হাঁটু মুড়ে চুলোর পাড়ে বসে আছেন মা। তাওয়ায় রুটি ভাজা হচ্ছে, কিন্তু মার যেন সেদিকে খেয়াল নেই। কীরকম আনমনা হয়ে আছেন তিনি।

সকালবেলা আনমনা থাকার মতো কীহল?

রাজু বলল, মা, তুমি খাচ্ছ না?

মা রাজুর দিকে তাকালেন না। বলল, পরে খাব।

কেন, এখন কী হয়েছে?

কিছু হয়নি।

তা হলে?

তুই খা। আমি পরে খাব।

কেন?

এমনি।

এখুনি খাও। অনেক বেলা হয়েছে।

মা কথা বললেন না।

আরেকটি রুটি গোল করে পেঁচিয়ে চায়ে ভেজাল রাজু। তারপর ভেজানো অংশটা মুখে দিয়ে বলল, তোমার জন্যে চা রেখেছ তো?

এবারও রাজুর দিকে তাকালেন না মা। বলল, আছে বোধহয়।

মানে কী?

চট করে রাজুর দিকে মুখ ফেরালেন মা। কিসের মানে?

চা আছে বোধহয় মানেটা কী? তুমি তোমার জন্যে চা রেখেছ কি না তা-ই বলো।

আমি দেখিনি।
কেন?
তোকে পুরো এক মগ দেয়ার পর যদি থেকে থাকে থাকবে, নয়তো নেই। দরকার হলে আমি আবার বানিয়ে নেব।
কেটলিটা রাজুর হাতের কাছেই ছিল। বাঁহাতে চট করে কেটলিটা সামান্য শূন্যে তুলল রাজু। ওজন করে বোঝার চেষ্টা করল চা আছে কি-না। তারপর কেটলিটা নামিয়ে রেখে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। আছে। কাপখানেক হবে। তোমার চলে যাবে।
মা কথা বললেন না।
রাজু আর একটা রুটি নিল। রুটিটা গোল করে প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলল, তোমাকে তো একটা খরব দেয়া হয়নি মা।
মা কথা বললেন না।
রাজু বলল, কথা বলছ না যে!
মা আনমনা গলায় বলল, কী বলব?
আমি যে একটা খবরের কথা বললাম, সে-ব্যাপারে তো তোমার কোনও আগ্রহ দেখছি না! ব্যাপারটা কী?
কোনও ব্যাপার নেই।
তা হলে খবরটা বলি।
বল।
খালেদ ভাই দেশে আসছেন।
কবে?
আগামী মাসের ছ তারিখে।
একা?
না, বউ নিয়ে।
তোকে বলল কে?
খালা।
কবে বলেছে?
কাল।
তারা খবর পেয়েছে কবে?
পরশু।
কে বলল?

আমি বলেছি।
মানে?
রাজু হাসল। বলেছি মানে কি, পরশুর আগের দিন সন্ধ্যায় বাজারের দিকে গেছি পিয়ন একটা চিঠি দিল। দিয়ে বলল হাসিআপাদের চিঠি। বিদেশি খামের চিঠি দেখেই বুঝে গেলাম খালেদ ভাইর চিঠি। কাল হাসিআপাদের বাড়ি গেছি খালা বলল আগামী মাসের ছ তারিখে বউ নিয়ে দেশে আসবেন খালেদ ভাই। খালেদ ভাই আসছেন শুনে খালা যে কী খুশি হয়েছেন! কাল থেকেই দেখি বাড়িতে বেশ একটা সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। সেধে সেধে এই এতটা দই আর চিড়ে খাইয়ে দিলেন আমাকে।
মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এতকাল পর ছেলে ফিরলে সব বাড়িতেই সাজ-সাজ রব পড়ে। সব মা-ই অমন খুশি হয়।
আমি যদি খালেদ ভাইর মতো এতদিন বিদেশে থাকতাম, এতকাল পরে ফিরে আসতাম, তুমি কী করতে মা?
মা কথা বললেন না।
রাজু বলল, বলো-না।
কী বলব?
তুমি কী করতে?
জানি না।
রাগ করছ কেন মা। বলো না!
আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না।
কেন?
এমনি।
এমনি-এমনি কারু কথা বলতে ভাল না লাগে?
লাগে।
রাজু একটু হেসে বলল, কদিন ধরে দেখছি তুমি আমার ওপর কীরকম গম্ভীর হয়ে আছ।
তাই নাকি?
হ্যাঁ।
তুই সেটা বুঝতে পেরেছিস?
পারব না কেন!
তা হলে কেন গম্ভীর হয়ে আছি সেটা বুঝতে পারছিস না?
না। কেন?

ভেবে দ্যাখো।
দেখেছি। কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।
তাই?
তাই।
তারপর একটু হেসে রাজু বলল, কারণটা বলো।
বলব?
বলো।
কিন্তু বলে লাভ কী হবে?
লাভ-লোকসান তো পরে। তুমি আগে বলো।
তোর জীবন কি এইভাবে যাবে?
আরেকটি রুটি মুখে দিতে যাচ্ছিল রাজু। কথাটা শুনে হাত থেমে গেল তার।
জীবন এইভাবে যাবে না তো কীভাবে যাবে?
আমি মরে গেলে তোকে রান্না করে খাওয়াবে কে?
তুমি মরবে কেন?
বয়স হলে মানুষ একসময় মরে যায়। যেমন তোর বাবা মরে গেছেন।
তোমার তেমন বয়স হয়নি। তোমার মরতে দেরি আছে।
যখনই হোক মরব তো!
তা মরবে। সে তো আমিও মরব।
সঙ্গে সঙ্গে রাজুকে বেশ একটা ধমক দিলেন মা। চুপ!
ধমক খেয়ে থতমত খেয়ে গেল রাজু। চোখ তুলে মার দিকে তাকাল।
ধমকাচ্ছ কেন?
মার সামনে বসে ছেলেদের কখনও মরার কথা বলতে নেই।
ছেলের সামনে বসে মার কি মরার কথা বলতে আছে?
মা-রা সবসময় ছেলেদের আগে মারা যায়।
আমার তো মনে হয় আমি তোমার
ডানহাতে সঙ্গে সঙ্গে রাজুর মুখ চেপে ধরলেন মা, আবার!
মার হাত সরিয়ে দিয়ে রাজু বলল, ঠিক আছে মরামরি বাদ দাও। কী বলছিলে বলো।
তোর জীবন কি এভাবে চলবে?
তা হলে কীভাবে চলবে?
তোর বয়স কত হয়েছে জানিস?

জানি।
কত?
সাতাশ-আটাশ।
হ্যাঁ। আটাশ বছর বয়স তোর। তোর এই বয়সে
আমি জানি লোকে বিয়ে করে ফেলে। বাচ্চাকাচ্চার বাপ হয়ে যায়।
তার আগে আরেকটা কাজ করে।
কী কাজ?
রুজিরোজগারের ব্যবস্থা।
সে তো যাদের কিছু না থাকে তারা করে।
যাদের থাকে তাদেরও করতে হয়।
মুখ বিকৃত করে রাজু বলল, মা, আবার সেই পুরনো প্যাচাল!
পুরনো হলেও প্যাচালটা খুব জরুরি।
রোজ রোজ একই জিনিশ নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করছ। আচ্ছা বলো কী করতে হবে।
আমি যা বলব তা-ই করবি তুই?
করব।
সঙ্গে সঙ্গে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল মার। সত্যি?
সত্যি।
তবু যেন রাজুর কথা বিশ্বেস হতে চায় না মার। রাজুর দিকে ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমাকে ছুঁয়ে বল।
মার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল রাজু। এই যে তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।
মা যে কী মুগ্ধ হলেন! এতকাল ধরে এসব নিয়ে রাজুকে বলে আসছেন রাজু কখনও কোনওকিছুতে রাজি হয়নি, মাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করা তো দূরের কথা।
রাজু বলল, কী করতে হবে বলো।
বিলের কোথায় কোন জমিটা আমাদের আছে তুই জানিস? চিনিস কোনটা কোনটা আমাদের জমি?
সবগুলো চিনি না।
তারপর মার দিকে তাকিয়ে রাজু বলল, আমাদের গোমস্তা মোতালেব চেনে না?
চেনে।
তা হলে?
মোতালেবের সঙ্গে গিয়ে সবগুলো জমি তুই চিনে আসবি।
আচ্ছা।

ভাল দোকান করা যায় এমন একটা ঘর দ্যাখ বাজারে।
আচ্ছা।
আসছে মৌসুম থেকে জমিগুলো সব তুই নিজে চাষ করবি। বর্গাদারদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিবি।
তা হলে দোকানের কী হবে?
দোকানও করবি।
দোকানও করব, চাষও করব?
হ্যাঁ, দুটোই করতে হবে। দুটোই তুই পারবি।
ঠিক আছে, করব।
টাকাপয়সা আমার কাছে যা আছে দোকান করার পর সব আমি তোকে বুঝিয়ে দেব।
আচ্ছা। তারপর?
আগামী বছর বিয়ে করিয়ে দেব।
কাকে?
কাকে আবার, তোকে?
মেয়ে কোথায়?
এখন থেকে খুঁজব।
আচ্ছা খুঁজো।
খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। রাজু এবার উঠল।
মা বললেন, কোথায় যাচ্ছিস?
মোতালেবের সঙ্গে বিলে যাই। জমিগুলো চিনে আসি।
মা খুবই খুশি হলেন। যা বাবা, যা।
রাজু বলল, বিকেলে যাব বাজারে। দু-একদিনের মধ্যেই দেখবে দোকানের ব্যবস্থা করে ফেলেছি।
মা কোনও কথা বললেন না। এতটা মুগ্ধ হয়েছেন, মুখে কথা জুটল না তাঁর।
বাজারের দিক থেকে হনহন করে হেঁটে আসছে রাজু। রাজুর স্বভাব হচ্ছে সে হাঁটে একেবারে রাস্তার মাঝখান দিয়ে। বাস ট্রাক দেখলে দ্রুত রাস্তার পাশে সরে যায়। কখনও কখনও এত আনমনা থাকে যে গাড়ির শব্দে চমকে ওঠে। ব্যাঙের মতো লাফ দিয়েও অনেক সময় গাড়ির সামনে থেকে সরে যেতে হয়েছে তাকে। গত কয়েকদিন রাজুর দাড়িগোঁফ আরও বড় হয়েছে। মুখ দেখে রাজুকে বেশ ক্লান্ত মনে হয়।

দূর থেকে রাজুকে দেখতে পেল নীলুভাবি। দুপুরের পরপর খাওয়াদাওয়া শেষ করে বার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নীলুভাবি। তখুনি রাজুকে দেখতে পেল, দ্রুত হেঁটে আসছে।

কাছাকাছি আসতেই রাজুকে ডাকল নীলুভাবি। এই রাজু, রাজু!

রাজু থমকে দাঁড়াল, কী?

কোত্থেকে এলে?

বাজারে গিয়েছিলাম।

দুপুর শেষ হয়ে গেল, এখন ফিরলে বাজার থেকে?

হ্যাঁ, ম্যালা কাজ ছিল।

কী কাজ?

এখন বলা যাবে না।

কেন?

আমি খুব ব্যস্ত।

কিসের এত ব্যস্ত!

বাড়ি যাচ্ছি। খুব খিদে পেয়েছে।

নীলুভাবি হাসল। খিদে ছাড়া তোমার মুখে কখনও অন্য কোনও কথা শুনলাম না।

রাজু বেশ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার খিদেটা বেশি।

এখন অবশ্য খিদে পাওয়ারই কথা। দুপুর শেষ হয়ে গেছে তো! ঠিক আছে, বাড়ি যেতে হবে না।

কেন?

এসো, আমার এখানে খেয়ে যাও।

খাওয়ার কথা শুনলে রাগ বলতে কোনও জিনিশ আর থাকে না রাজুর। পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার কথা মুহূর্তে ভুলে যায় সে। এখনও তা-ই হল। মহাসড়কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সে। নীলুভাবির কথায় তার বাড়ির দিকে উঠে এল। ঠিক তখুনি শাঁ শাঁ করে একটি মিনিবাস এল। আর একটু হলে রাজুকে প্রায় চাপাই দিয়েছিল গাড়িটা।

নীলুভাবি বলল, তুমি যেভাবে চলাফেরা কর রাজু, কোনদিন যে গাড়ি চাপা পড়ে মরবে!

নীলুভাবির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল রাজু। এখন মরা যাবে না।

মানে?

কয়েকদিন হল নিজের জন্যে সব শুরু করেছি আমি।
আচ্ছা!
বর্গাদারদের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, এই সিজনের পর জমি সব ছেড়ে দেবে তারা। আমি নিজে আমাদের জমিগুলো চাষ করব।
তাই নাকি?
হ্যাঁ। বাজারে একটা দোকানও করছি।
এ্যাঁ!
হ্যাঁ। তিরিশ হাজার টাকা সেলামি লাগবে। কথাটথা পাকা হয়ে গেছে। ঘরে কাজ সামান্য বাকি আছে। পনেরো তারিখ নাগাদ শুরু করা যাবে।
হঠাৎ এতকিছু শুরু করলে!
মার জন্যে। মা প্রতিদিন ঘ্যানঘ্যান করে, এত বড় হয়ে গেলাম কিছু করছি না। এভাবে কি দিন যাবে! মার বয়স হয়েছে। মরে যাওয়ার আগে আমাকে বিয়েশাদি করিয়ে, আমার সংসার গুছিয়ে দিয়ে যাবে তো!
খুব ভাল কথা।
কিন্তু আমার এত তাড়াতাড়ি এসব করার ইচ্ছে ছিল না জানেন!
তা হলে করছ কেন?
মার জন্য। মা অবশ্য অনেকদিন ধরেই বলছিল। আমি পাত্তা দিইনি। সেদিন হঠাৎ তাকে ধরে প্রতিজ্ঞা করতে হল। প্রতিজ্ঞা একবার করে ফেললে সে-কাজ আমি তো আর না করে পারি না।
তা তো বটেই।
তারপর একটু হেসে নীলুভাবি বলল, বিয়ে করছ কবে?
আরে সে দেরি আছে!
কবে?
আগামী বছর।
এত দেরি কেন?
দোকান গুছিয়ে বসতে, দোকান জমাতে সময় লাগবে না!
তা লাগবে।
আমার প্ল্যান হচ্ছে দোকানটি সাংঘাতিক জমিয়ে ফেলব আর নিজেদের জমির প্রথম সিজনটা করব। তারপর বিয়ে।
মেয়ে দেখেছ?
আরে ধুৎ! ওসব আমি দেখব কেন?
তাহলে কে দেখবে?

মা।
মার পছন্দে বিয়ে করবে?
তো কার পছন্দে করব।
আজকালকার ছেলেরা তো নিজের পছন্দে বিয়ে করে।
আমর ওসব নেই। আমার মা যা বলবে তা-ই করব। কানা খোঁড়া একটা ধরে এনে যদি বলে বিয়ে কর, করে ফেলব।
তারপর নীলুভাবির চোখের দিকে তাকাল রাজু। ভাবি, খেতে দেবেন, না গল্পই করবেন!
নীলুভাবি হাসল। তুমি হাতমুখ ধোবে না?
হ্যাঁ।
তো ধুয়ে এসো।
কিন্তু আপনার তো কোনও আয়োজন দেখছি না! একটা লোককে ভাত খাওয়াবেন বলে রাস্তা থেকে ডেকে আনলেন, কই, তারপর যে কিছু বলছেন না!
নীলুভাবি বলল, তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো-না। এসে দেখবে সব রেডি।
ঠিক আছে।
রাজু কলতলার দিকে চলে গেল।
নীলুভাবি তখন তার কাজের মেয়ে ফরিদাকে ডাকল। ফরিদা!
ফরিদা ছিল রান্নাঘরে, সেখান থেকে সাড়া দিল, জি আপা।
একজনের খাবার দে।
দিতাছি।
তরকারি-টারি ভাল করে গরম করে দিস।
আইচ্ছা।

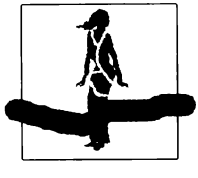

নীলুভাবি উৎফুল্ল গলায় বলল, রাজু, তোমার হাসিআপার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।
রাজু খুব আয়েশ করে খাচ্ছিল। মনোযোগ খাওয়ার দিকে। নীলুভাবির কথা শুনে তার দিকে তাকাল না সে। বলল, কোথায়?

স্কুলে।
কোন স্কুলে?
বন্যাদের স্কুলে।
বন্যা কে?
নীলুভাবি অবাক হল। আরে আমার মেয়ে!
রাজু হাসল, ও। ওই স্কুলে তো টুপুও পড়ে।
হ্যাঁ। হাসিআপা টুপুর সঙ্গে গিয়েছিল।
তারপর?
অনেক কথা হল।
কী কথা?
টুপুর মা-বাবার কথা, হাসিআপার কথা।
টুপুর মা-বাবা তো দেশে আসছে।
কবে?
সামনের মাসের ছ তারিখে।
তাই নাকি?
হ্যাঁ।
বউ না নিয়ে এলেও পারতেন ভদ্রলোক।
কেন?
বাচ্চার মন-খারাপ হবে না!
কেন?
সৎমা!
আরে, টুপু সৎমা আপন মার কী বোঝে।
টুপু তো জানে তার মা মারা গেছে!
তা জানে।
তা হলে?
মহিলা যদি ভাল হয় টুপুকে ম্যানেজ করে ফেলবে।
বিদেশে থাকা মহিলা কি তেমন হবে?
হতেও পারে। বাঙালি তো!
তা ঠিক।
খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে রাজুর। পাতে সামান্য ভাত আর এক টুকরো মাছ পড়ে আছে। খেতে খেতে রাজু বলল, ভাত খাওয়ার পর আমি এককাপ চা খাব।
নীলুভাবি বলল, বলে দিয়েছি।

রাজু চোখ তুলে নীলুভাবির দিকে তাকাল। মানে?
চায়ের কথা ফরিদাকে বলে দিয়েছি।
ভেরি গুড।
খাওয়া শেষ করে প্লেটেই হাত ধুয়ে ফেলল রাজু। নীলুভাবি একটা গামছা এগিয়ে দিল। হাত মুছতে মুছতে রাজু বলল, আর কী কী কথা হল হাসিআপার সঙ্গে?
অনেক কথা। প্রায় সবই জেনেছি, কেবল একটা কথা জানা হয়নি।
কী?
সে বিয়ে করেনি কেন।
ও।
তুমি জান?
জানি।
এ্যাঁ।
হ্যাঁ। জানব না কেন? হাসিআপারা এমনিতে আমাদের কোনও আত্মীয় হয় না। একই গ্রামে থাকি। হাসিআপাকে আমি আপা বলি, তার মাকে বলি খালা। সম্পর্কটা আপনের মতোই।
তা হলে আমাকে একটু বলো তো!
কী বলব?
হাসিআপা বিয়ে করেনি কেন?
হাসিআপার একটা প্রেম ছিল।
তাই নাকি?
হ্যাঁ।
তো তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি কেন?
ভদ্রলোক বোধহয় মারা গেছেন।
নীলুভাবি ভুরু কুঁচকে বলল, বোধহয় মারা গেছেন মানে?
আমাদের গ্রামেরই লোক। মঞ্জুভাই। তখন ঢাকায় থেকে ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার বেশ কিছুদিন আগেই গ্রামে এসেছিলেন। খালেদ ভাইর বন্ধু। দিনরাত পড়ে থাকতেন হাসিআপাদের বাড়ি। গ্রামের সবাই জানত হাসিআপার সঙ্গে মঞ্জুভাইর প্রেম। হাসিআপার সঙ্গে মঞ্জুভাইর বিয়ে হবে।
ঠিক তখুনি দুকাপ চা নিয়ে এল ফরিদা। হাত বাড়িয়ে একটা কাপ নিল রাজু। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, মঞ্জুভাই আর খালেদভাই একসঙ্গেই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। খালেদ ভাই ফিরে এলেন, মঞ্জুভাই ফিরলেন না। মারা গেছেন কি

না সেটিও কেউ জানে না। হাসিআপা তার পর থেকে মঞ্জুভাইর জন্যে অপেক্ষা করছেন।
মানে?
হাসিআপার ধারণা মঞ্জুভাই বেঁচে আছেন। কোনও একদিন হাসিআপার কাছে ফিরে আসবেন তিনি। মঞ্জুভাই ছাড়া কারু বউ হাসিআপা হতে পারেন না।
অদ্ভুত তো!
রাজু আবার চায়ে চুমুক দিল। হাসিআপাদের ফ্যামিলিটা একটু অদ্ভুত ধরণেরই। বউ মারা যাওয়ার পর খালেদ ভাই তো আধাপাগল হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চা ফেলে চলে গেল আমেরিকায়। সেখানে গিয়ে আবার বিয়েও করল। এদিকে হাসিআপা বুড়ো হতে চলল, এতদিন কেটে গেছে তবু তার ধারণা মঞ্জুভাই বেঁচে আছেন। কোনও-না-কোনওদিন তার কাছে ফিরে আসবেন।
নীলুভাবি আর কথা বলল না। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

খালেদ বলল, আমার খুবই অবাক লাগছে।
মণিকা বসেছে জানালার পাশে। জানালার কাচ সামান্য ফাঁক করা। মাইক্রোবাসটা চলছে মাঝারি ধরনের স্পিডে। তবু হুহু-করা একটা হাওয়া আসছে জানালার ফাঁক দিয়ে। সেই হাওয়ায় চুল উড়ছে মণিকার।
কথা শুনে খালেদের দিকে মুখ ফেরাল মণিকা। অবাক লাগছে কেন?
তুমি আমার সঙ্গে বাংলাদেশে চলে এসেছ।
আমি তো বাংলাদেশেরই মেয়ে।
তবু তুমি তো কখনও দেশে আসনি।
আসিনি। এবার এলাম।
তারপর একটু থেমে মণিকা বলল, বাংলাদেশটা কিন্তু বেশ সুন্দর।
সুন্দর তো বটেই।
শহরের চে গ্রামের দিকটা বেশি সুন্দর।
হ্যাঁ। আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা গ্রামবাংলার সৌন্দর্য নিয়ে অনেক গল্প-কবিতা লিখেছেন।

মণিকা মন-খারাপ-করা গলায় বলল, তবে খুবই গরিব দেশ।
সাংঘাতিক গরিব। আর তুমি যেহেতু জন্মেছ আমেরিকায়, আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচে ধনী দেশ, সে-দেশ থেকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এলে দেশটাকে তো গরিব লাগবেই।
মণিকা কথা বলল না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।
খালেদ বলল, তবু তো দেশের অবস্থা এখন অনেক ভাল। স্বাধীনতার পর বিস্তর উন্নতি তো দেশের হয়েছেই। এই যে রাস্তাটি দিয়ে ঢাকা থেকে আমরা এখন গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি, মাত্র ঘণ্টাখানেক লাগবে বাড়ি পৌঁছাতে। তুমি জান, এইটুকু রাস্তা পেরিয়ে যেতে আমাদের আগে পুরো একটা দিন লাগত।
এ্যাঁ!
হ্যাঁ। ভোর ছটায় আমাদের নদীর ঘাট থেকে লঞ্চে চড়লে ঢাকা এসে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে যেত।
বল কী?
হ্যাঁ।
কেন?
লঞ্চে বহুদূর ঘুরে যেতে হত।
একটু হাসল খালেদ। পকেট থেকে সিগ্রেট বের করল। লাইটার বের করল। তারপর সিগ্রেট ধরিয়ে বড় করে সিগ্রেটে টান দিল। এই রাস্তাটি হয়েছে অবশ্য বেশিদিন হয়নি। আমি যাওয়ার অনেক পরে হয়েছে। তবে রাস্তা হওয়ার ফলে পুরো এলাকার চেহারা ঘুরে গেছে।
মণিকা কথা বলল না।
ওরা দুজন বসেছে মাইক্রোবাসের মাঝখানকার সীটে। পেছনে তিন-চারটে ব্যাগ সুটকেস। মাইক্রোবাসের ঝাঁকুনিতে মাঝেমধ্যে বেশ শব্দ করছিল ব্যাগ সুটকেস। খালেদ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। তাকিয়ে আনমনা হয়ে গিয়েছিল। সিগ্রেটে টান দিয়ে বলল, কিছুই চিনতে পারছি না।
মণিকা অবাক গলায় বলল, বল কী।
খালেদ মণিকার দিকে মুখ ফেরাল। হাসল। হ্যাঁ, সত্যি।
বাড়ি চিনতে পারবে তো?
বুঝতে পারছি না। বোধহয় অসুবিধা হবে।
তা হলে?
তেমন ভয়ের কোনও কারণ অবশ্য নেই। রাস্তাটা শেষ হয়েছে একেবারে পদ্মানদীর পারে গিয়ে। ওখানে গিয়ে পৌঁছুলে বাড়ি খুঁজে বের করা কঠিন হবে

না। তা ছাড়া এলাকার লোকজন কেউ-না-কেউ তো আমাকে চিনবেই। বাড়ি নিয়ে পৌঁছেও দেবে। অসুবিধা নেই।
মণিকা কথা বলল না।
খালেদ বলল, রাস্তাটা আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই গেছে। অসুবিধা হলেও চিনতে ঠিকই পারব। জায়গামতো গিয়েই গাড়ি দাঁড় করাব।
মণিকা বলল, এতকাল পর তোমাকে দেখে তোমার মা বোন এবং মেয়েটি কেমন করবে তোমার মনে হয়?
হাতের সিগ্রেটে শেষ হয়ে এসেছিল। সিগ্রেটে শেষটান দিয়ে জানালা দিয়ে সিগ্রেটের শেষ অংশ বাইরে ছুড়ে ফেলল খালেদ। বলল, মা আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদবে আমি জানি। মার কান্না দেখে কাঁদবে হাসি।
তুমি কাঁদবে না?
বলা যায় না, কান্না আসতেও পারে।
আমার ওসব কান্নাকাটি খুব ফানি মনে হয়।
আমেরিকায় জন্মেছ এবং থেকেছ তো, এসব তোমার ফানিই মনে হবে। তবে এগুলো হচ্ছে মানুষের ভালবাসার প্রকাশ। ভালবাসার মুহূর্তে কোনও কোনও মানুষ কাঁদে।
মণিকা হাসল। তোমার অত সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথা বলবার দরকার নেই, আমি ফান করলাম। ছবছর পর ছেলে ফিরে এলে মা তো কাঁদবেই। ভাই ফিরে এলে বোন তো কাঁদবেই। পৃথিবী যত আধুনিকই হোক, মানুষ উন্নতির চরম শিখরে গিয়ে পৌঁছুক, তবু মানুষের এইসব আবেগ, হৃদয়ের টান কখনও নষ্ট হবে না। মানুষ কখনও কাঁদতে ভুলে যাবে না।
মণিকার কথা শুনে খালেদ বেশ খুশি হল। বলল, আমরা ইচ্ছে করলে কিন্তু আরও অনেক আগে বাংলাদেশে আসতে পারতাম।
তা তো পারতামই। বিয়ে হওয়ার পরই তো, তুমি আমেরিকায় যাওয়ার বছরখানেক পরই তো আমাদের বিয়ে হল, আমার আমেরিকান পাসপোর্ট, তোমার পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড হয়ে গেল, তখুনি ইচ্ছা করলে দেশে আসতে পারতাম আমরা।
আমি তো আসতে চেয়েছি।
তা চেয়েছ।
তোমার জন্যই আসা হয়নি।
হ্যাঁ।

মণিকা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?
করো।
সব জেনেশুনেই তো তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে।
কী সব?
আমি বিবাহিত। স্ত্রী মারা গেছে। কিন্তু আমার একটি কন্যা আছে। দেশে সে আমার মা বোনের কাছে থাকে। এসব জেনেই তো তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে।
হ্যাঁ। কারণ ওটাকে আমার তেমন কোনও ব্যাপার মনে হয়নি। আমি তোমাকে ভালবেসেছি। বিয়ে করে আমি আমার ভালবাসার মর্যাদা দিতে চেয়েছি। তোমার স্ত্রী মারা না গিয়ে জীবিতও যদি থাকতেন তবু হয়তো আমি তোমাকে বিয়ে করতাম এবং তোমাকে হয়তো কখনও দেশে তোমার সেই স্ত্রীর কাছে যেতে দিতাম না। তাদেরকে তুমি টাকা-পয়সা পাঠাতে, তাতে অবশ্য আমি কোনও আপত্তি করতাম না।
স্ত্রী জীবিত থাকলে আমার তো বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। সত্যি বলতে কী এই জীবনে তোমার সঙ্গে আমার হয়তো দেখাই হত না।
কেন?
কেন আবার, আমার তো আমেরিকায় যাওয়াই হত না।
আমি জানি তুমি তোমার প্রথম স্ত্রীকে খুব ভালবাসতে।
ভালবাসার চেও বড় ব্যাপার ছিল
কথাটা শেষ করল না খালেদ। থেমে গেল।
মণিকা বলল, বলো।
ভালবাসার চেও বড় ব্যাপার ছিল অভ্যেস। ঢাকায় থেকে চাকরিবাকরি করতাম আমি। ওরা থাকত গ্রামের বাড়ি। প্রত্যেক মাসে বাড়ি যেতাম। মেয়েটি হল। সব মিলিয়ে ভালই ছিলাম। মা বোন স্ত্রী কন্যা। মোটামুটি সচ্ছল অবস্থা। টুপুর মা মারা যাওয়ায় হঠাৎ করে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। আমি বেশ অ্যাবনরম্যাল হয়ে গিয়েছিলাম। ছুটিটুটি না নিয়ে তিন-চারমাস গ্রামের বাড়িতে বসে রইলাম। চাকরি চলে গেল। মেয়েটির ব্যাপারে গেলাম উদাস হয়ে। তারপর তো আমেরিকায়ই চলে গেলাম। তোমাকে পেলাম। নতুন করে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। জীবন অন্যরকম হয়ে গেল।
মণিকা গম্ভীর গলায় বলল, আমি অবশ্য তোমার সঙ্গে একটা অন্যায় করেছি।
খালেদ দূরাগত গলায় বলল, কী?
মা বোন এবং টুপুর কথা আমি তোমাকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছি।

এজন্যে তোমাকে আমি কোনও দোষ দিই না। তোমার জায়গায় অন্য মেয়ে হলেও তা-ই করত।
তোমার মা-বোনকে নয়, আমার সব চাইতে হিংসে হত টুপুকে।
অতটুকু মেয়েকে কিসের হিংসে তোমার?
মনে হত, তোমার মেয়ে টুপু ঠিকই, কিন্তু সে আমার গর্ভে জন্মায়নি। জন্মেছে আরেকজনের গর্ভে। তুমি আমার, তোমার সবকিছু আমার। সেই তোমার একটি মেয়ে জন্মেছে অন্যের গর্ভে! হিংসেয় আমার বুক জ্বলে যেত। প্রথম প্রথম হিংসেটা হত টুপুর মাকে। তারপর যেহেতু টুপুর মা বেঁচে নেই এজন্যে হিংসেটা গিয়ে পড়ে টুপুর ওপর।
মণিকার কথা শুনে মণিকার জন্যে এমন মায়া হল খালেদের, ডানহাতটা মণিকার কাঁধে রাখল সে। মুগ্ধ চোখে মণিকার দিকে তাকিয়ে রইল।
মণিকা বলল, এজন্যে তোমাকে আমি কখনও দেশে আসতে দিতে চাইনি। দেশে এলেই টুপুর জন্যে পাগল হয়ে যাবে তুমি। টুপুকে ফেলে চলে যেতে পারবে না। কারণ আমি তো তোমাকে চিনি, মনের দিক দিয়ে তুমি খুবই নরম। নিজের ওই বয়সি মেয়ের মুখটি তুমি যদি একবার দেখে ফেল, আমাকে তুমি ভুলে যেতে পারবে, কিন্তু টুপুকে ভুলতে পারবে না। সব ফেলে মেয়ের কাছে থেকে যাবে।
কী করে এসব বুঝেছিলে?
প্রথম প্রথম তুমি যখন টুপুর কথা বলতে তখুনি বুঝেছিলাম।
তা হলে বলো তো টুপুকে ওভাবে ফেলে কেমন করে চলে গিয়েছিলাম আমি?
তখন তো তুমি আসলে অ্যাবনরম্যাল ছিলে।
হ্যাঁ। আমেরিকায় গিয়ে, বিয়ের পর টুপুর জন্যে আমি একসময় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম জান। প্রায়ই তোমাকে বলতাম, চলো দেশে যাই, টুপুকে আমাদের কাছে নিয়ে আসি।
তখুনি টুপুকে নিয়ে হিংসেটা শুরু হয় আমার। এবং আমি চাই যত দ্রুত সম্ভব একটি বাচ্চা হোক আমাদের।
মনিকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর উদাস দুখি গলায় বলল, তখনও জানতে পারিনি সন্তান গর্ভে ধরার ক্ষমতা আমার নেই। এই জীবনে আমি কখনও মা হতে পারব না।
খালেদ আবার সিগ্রেট ধরাল।
মণিকা বলল, মা হতে পারব না জানার পর একটি বাচ্চার জন্যে কী যে আকুলতা তৈরি হল আমার! এতটা কিন্তু আগে ছিল না। যখনই জানলাম মা আমি হতে পারব না তখুনি এমন হল। তখন থেকেই টুপুর জন্যে আস্তে ধীরে

একটি মায়া তৈরি হল আমার। আমার না হোক টুপু তো তোমার মেয়ে। তোমার মেয়ে, সেই অর্থে আমারও মেয়ে। তা হলে টুপুকে আমি ওই অতদূরে ফেলে রাখব কেন! আমার মেয়ে কেন পড়ে থাকবে অন্যের কাছে!

খালেদ সিগ্রেটে টান দিল। কথা বলল না।

মণিকা বলল, টুপুর জন্যে আমার এই আকর্ষণের কথা আমি তোমাকে সহজে বলতে পারিনি।

খালেদ বলল, যখন বলেছ তখন দীর্ঘ সময় আমাদের জীবন থেকে পেরিয়ে গেছে। টুপুকে আমরা অনেক আগেই আমাদের কাছে নিয়ে যেতে পারতাম।

হ্যাঁ। তা হলে এতদিনে টুপুর সঙ্গে মা-মেয়ের সম্পর্কটা আমার পাকা হয়ে যেত। তুমি চেষ্টা করলে সে অবশ্য এখন হবে।

হবে হয়তো।

হয়তো কেন?

টুপু এখন বড় হয়ে গেছে। অনেককিছু বোঝে। চার-পাঁচ বছর আগে সে অনেক ছোট ছিল। ভালবেসে তাকে নিজের মেয়ে হিশেবে গড়ে নিতে আমার অনেক সুবিধে হত। তবু আমি আমার ভালবাসা দিয়ে টুপুকে জয় করব। টুপুকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। এমন করে ভালবাসব টুপুকে, কিছুতেই সে বুঝতে পারবে না আমি তার আপন মা নই।

ঠিক তখুনি প্রায় চিৎকার করে উঠল খালেদ। ড্রাইভার সাহেব গাড়ি রাখুন। এসে গেছি। খালেদকে দেখেই চিনতে পারল রাজু। বাজারের দিকে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ রাস্তার পাশে মাইক্রোবাস দাঁড়াতে দেখে সেও দাঁড়াল। তার পরই খালেদকে দেখতে পেল, মণিকাকে দেখতে পেল রাজু। ওরা ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমেছে। নেমে দুজনেই অচেনা চোখে চারদিক তাকাচ্ছে।

রাজু তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে এল খালেদ এবং মণিকার সামনে। কোনও ভণিতা না করে বলল, গাড়ি এখানে থামিয়েছেন কেন? বাড়ি তো পেছনে!

খালেদ তীক্ষ্ণ চোখে রাজুর মুখের দিকে তাকাল। তুমি?

আরে আমি রাজু! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না খালেদ ভাই!

খালেদ এবার মুখ উজ্জ্বল করে হাসল। তা-ই বলো রাজু। আরে তুই তো বিশাল হয়ে গেছিস! তোকে তো আমি চিনতেই পারিনি!

তার পরই যেন মণিকার কথা মনে পড়ল খালেদের। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। খালেদ হাসিমুখে মণিকার দিকে তাকাল। মণি-এ হচ্ছে রাজু। আমাদের এক গ্রাম-সম্পর্কের ভাই। খুব ভাল ছেলে। আমি ওকে এই এতটুকু দেখে গেছি। ছবছরে বিশাল হয়ে গেছে।

রাজুর দিকে তাকিয়ে হাসল মণিকা। হ্যালো।

পরিচিত হওয়ার সময় কেউ হ্যালো করলে যার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে তারও যে হ্যালো করতে হয় এতসব জানে না রাজু। সে মণিকার দিকে তাকিয়ে রইল।
খালেদ বলল, রাজু, এ হচ্ছে তোর ভাবি।
রাজু হাসল। বুঝতে পেরেছি।
তারপর হাত তুলে মণিকাকে সালাম দিল।
মণিকা হাসল।
রাজু তারপর খালেদকে বলল, কিন্তু গাড়ি এখানে থামিয়েছেন কেন? বাড়ি তো পেছনে।
খালেদ বলল, আমি তো কিছু চিনতেই পারছি নারে! একী অবস্থা! সবকিছু এমন করে বদলে গেছে!
রাস্তার জন্য।
তাই তো দেখছি! সেই গ্রাম তো আর নেই রে! এ তো দেখছি আধাটাউন হয়ে গেছে! গাছপালা নেই, ঝোপঝাড় নেই।
চলুন, আমি আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।
কোথায় যাচ্ছিলি তুই?
বাজারে।
আমাদের সঙ্গে গেলে তোর কাজের ক্ষতি হবে না।
আরে কিসের কাজ! কাজ তো এখনও শুরু করিনি।
মানে?
বাজারে একটা দোকান করব আমি। ঘরটা এখনও রেডি হয়নি। কাজ চলছে। আরও পাঁচ-সাতদিন লাগবে রেডি হতে। এমনিতেই দেখতে যাচ্ছিলাম।
ও। তোর মা ভাল আছেন রাজু?
হ্যাঁ।
আমাদের বাড়ির খবরটবর কী?
ভাল। চলুন বাড়ি গিয়েই সব দেখবেন।
গাড়িটা কি এখানেই রেখে যাব?
না। গাড়ি তো একেবারে বাড়ির উঠোনে যাবে।
বলিস কী!
হ্যাঁ।
চল তা হলে গাড়িতে উঠি।
চলুন।
গাড়িতে চড়ে রাজু বলল, গাড়িটা কি আমেরিকা থেকে নিয়ে আসছেন নাকি খালেদ ভাই?

খালেদ বলল, আরে না!
তা হলে?
এক বন্ধুর গাড়ি। ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছি। যে-কদিন গ্রামে থাকি গাড়িটা আমার সঙ্গে থাকবে। ঢাকায় গিয়ে ফেরত দিয়ে দেব।
মণিকা একেবারেই চুপচাপ হয়ে আছে। খালেদ একবার মণিকার দিকে তাকাল। তারপর রাজুকে বলল, রাজু, ড্রাইভারকে রাস্তা চিনিয়ে দিস।
আচ্ছা।
ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল।

খালেদকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন মা। মণিকার দিকে ফিরেও তাকালেন না। খালেদেরও চোখ ভরে গেছে জলে। তবু মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল সে। কেঁদো না মা, কেঁদো না। দেশে এসে তোমাকে যে দেখতে পেলাম এই তো আমার বড় সৌভাগ্য। তুমি যে আমার জন্যে এখনও বেঁচে আছ এরচে বড় পাওয়া আমার জীবনে আর কী হতে পারে।
অদূরে দাঁড়িয়ে আছে হাসি আর টুপু। তাদের পাশেই মণিকা। হাসি এবং মণিকা দুজনের চোখই ছলছল করছে। কেবল টুপুই স্বাভাবিক। জড়াজড়ি করে কাঁদতে থাকা দুজন মানুষের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সে।
হাত বাড়িয়ে টুপুর একটা হাত ধরতে চাইল মণিকা। এসো আমার কাছে, এসো টুপু।
চট করে সরে গেল টুপু। মণিকাকে নিজের হাত ধরতে দিল না।
ব্যাপারটা খেয়াল করে হাসি বলল, কী হল টুপু? যাও। তোমার আম্মু তো!
টুপু কথা বলল না। হাসিকে জড়িয়ে ধরে হাসির কোমরের কাছে মুখ লুকাল।
মণিকার মুখের দিকে তাকাল হাসি। প্রথম প্রথম তো, লজ্জা পাচ্ছে।
মণিকা এগিয়ে এসে টুপুর চুলটা একটু নেড়ে দিল। হাসিমুখে বলল, তাই নাকি! বাহ্, টুপুমণির এত লজ্জা!
এতক্ষণে কান্নাটা থেমেছে মার। খালেদ তাঁকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কী হয়েছে মা! চলো ঘরে চলো।

মণিকা বলল, এই, তুমি তোমার মেয়েকে দেখছ না? দ্যাখো কত বড় হয়ে গেছে। ভারি লাজুক হয়েছে। আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না। মুখ লুকিয়ে আছে।
এই প্রথম মেয়ের দিকে তাকাল খালেদ। কিন্তু টুপুর মুখ দেখতে পেল না। মুখটা টুপু তখনও লুকিয়ে রেখেছে হাসির কোমরের কাছে।
টুপুর দিকে তাকাতে গিয়ে হাসির চোখের দিকে তাকাল খালেদ। তাকিয়ে কেন যে আবার জলে চোখ ভরে এল তার। গলা ধরে এল।
নিজেকে সামলে নিয়ে খালেদ বলল, কেমন আছিস হাসি?
এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না হাসি। চোখ তারও ততক্ষণে জলে ভরে এসেছে। মুখটা অন্যদিকে ঘোরাল হাসি।
হাসি যে কান্না লুকোবার জন্যে এমন করল ব্যাপারটা বুঝতে পারল খালেদ। বুঝে হাসিকে আর কোনও প্রশ্ন করল না। টুপুর দিকে মনোযোগ দিল। গভীর গলায় ডাকল, টুপু!
টুপু সাড়া দিল না। নড়ল না। হাসিকে যেমন ধরে রেখেছিল, ধরে রাখল। খালেদ আবার ডাকল। মাগো, আমার কাছে এসো মা।
টুপু তবু নড়ল না।
মা কান্না সামলে বলল, টুপু, তোমার বাবা তো! যাও, বাবার কাছে যাও।
হাসি ততক্ষণে নিজেকে সামলেছে। জোর করে টুপুকে সে ছাড়িয়ে দিতে চাইল। একী টুপু! বাবা ডাকছেন, যাচ্ছ না কেন তাঁর কাছে!
টুপু আ আ করে দুতিনটে শব্দ করল। কিন্তু হাসিকে ছাড়ল না। কারু দিকে মুখও ফেরাল না।
মণিকা বলল, থাক জোর করবার দরকার নেই। কোনও কোনও শিশু এমন করে। দুএক ঘণ্টার মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।
খালেদ বলল, ঠিক আছে।
তারপর মণিকার দিকে তাকিয়ে হাসিহাসি মুখ করে বলল, মণি, তুমি নিশ্চয় বুঝে গেছ কে আমার মা, কে বোন?
মণিকা হাসল। হ্যাঁ। মেয়েকেও চিনেছি।
ঠিক তখুনি মা এগিয়ে এলেন মণিকার কাছে। এসে মণিকার পিঠে হাত রাখলেন। এসো মা, ঘরে এসো।
ড্রাইভারকে নিয়ে রাজু ততক্ষণে ব্যাগ সুটকেস সব ঘরে তুলে ফেলেছে। ওরা সবাই ঘরের দিকে এগুচ্ছে দেখে ঘর থেকে বেরুল সে। আমার তো কাজ শেষ। আমি তা হলে যাই।

হাসি বলল, খেয়ে যা।
না, আজ থাক।
মা বললেন, কেন?
খালেদ ভাই মাত্র এলেন, সঙ্গে নতুন বউ, তোমাদের আজ এত ঝামেলা!
খালেদ হাসল। কিছু হবে না। তুই থাক। খেয়ে যা আমাদের সঙ্গে।
আরেকদিন খাব। আজ আমার একটু কাজ আছে।
মা বললেন, এমনিতে জোর করে এসে খেয়ে যাস, আর আজ তোকে খাওয়াতে পারছি না। ঠিক আছে, যা।
হাসি বলল, তোর কাজ সেরে আসিস তো রাজু!
রাজু বলল, কেন?
কাজ আছে।
কী কাজ?
ভাইয়া-ভাবি এলেন, কতরকমের কাজ বাড়িতে। বাজারে টাজারে পাঠাতে হবে তোকে।
ঠিক আছে, আসব।
তারপর হাসির দিকে আঙুল তুলে রাজু বলল, তবে আমাকে কিন্তু আগের মতো যখন- তখন ডেকে পাবে না। তোমরা তো জানই আমি খুব ব্যস্ত হয়ে গেছি।
হনহন করে দুতিন পা এগিয়ে গেল রাজু। তারপর যেন হঠাৎ কোনও কথা মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে ফিরে এল। মণিকার সামনে দাঁড়িয়ে মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যালো!
তারপর ছুটে চলে গেল।
রাজুর ভঙ্গি দেখে হাসতে লাগল সবাই।
মণিকা বলল, ভেরি ইন্টারেসটিং। আই লাইকড ইট।

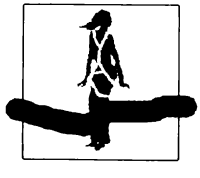

খালেদ বলল, বিয়ের পরপরই আমি চেয়েছিলাম টুপুকে নিয়ে যেতে।
মা বলল, নিসনি কেন?
মণিকাকে রাজি করাতে পারিনি।

কেন, বিয়ের আগে বউমাকে তুই সবকিছু খুলে বলিসনি?
বলেছি।
তা হলে?
বিয়ের আগে সে তেমন কোনও আপত্তি করেনি। বিয়ের কিছুকাল পর কথা তুলতেই হঠাৎ করে বেঁকে বসল।
কেন?
কে জানে! মেয়েদের মন তো, বোঝা মুশকিল।
মা কথা বললেন না। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
মা বসে আছেন পালঙ্কের একপাশে, হেলান দিয়ে। মায়ের কোলের কাছে মাথা দিয়ে শিশুর মতো শুয়ে আছে খালেদ। আস্তে ধীরে খালেদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন মা।
মা বললেন, পাঁচ বছর হল বিয়ে হয়েছে, বাচ্চাকাচ্চা হয়নি কেন তোদের?
খালেদ বলল, মণিকার কখনও বাচ্চা হবে না মা।
এ্যাঁ।
হ্যাঁ। আমেরিকার মতো দেশে থাকি। প্রচুর চেষ্টা মণিকাকে নিয়ে এই পাঁচ বছর করা হয়েছে। মণিকা কখনও মা হতে পারবে না।
বলিস কী?
হ্যাঁ মা।
ফ্যালফ্যাল করে খালেদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মা।
খালেদ বলল, এই কারণেই তো মণিকাকে নিয়ে দেশে আসা গেল।
মানে?
নিজের বাচ্চা হবে না বলে টুপুর জন্যে তার একটি মায়া জন্মেছে। টুপুকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমার সঙ্গে দেশে চলে এসেছে সে।
কিন্তু টুপুকে সে আদর করবে?
কেন করবে না!
সে তো আর টুপুর আপন মা নয়।
আমার মনে হয় করবে।
কেন মনে হয় তোর?
মণিকার মনটা খুব নরম।
তবু নিজের বাচ্চা আর অন্যের বাচ্চা!
অন্যের বাচ্চা মানে! টুপু তো আমার বাচ্চাই!

কিন্তু সে তো আর মণিকার গর্ভে জন্মায়নি।
মণিকা যেহেতু নিজে কখনও মা হতে পারবে না, আমার মনে হয় টুপুকে সে আপন মায়ের মতোই ভালবাসবে। আর অতটা কনফার্ম না হলে মণিকাকে নিয়ে টুপুকে নিতে দেশে আমি আসতাম না।
তারপর একটু থেমে খালেদ বলল, তুমি কী বল?
মা ম্লান গলায় বললেন, আমি কী বলব?
টুপুকে নিয়ে যেতে চাই এ-ব্যাপারে তুমি কিছু বলবে না!
আমি কী বলব! তোর মেয়ে, তুই তো নিয়ে যাবিই।
আমার মেয়ে টুপু ঠিকই, কিন্তু টুপুর জন্যে আমি তো আমার কোনও দায়িত্বই পালন করিনি। টুপুর মা মারা গেল। আমি একটু অ্যাবনরম্যাল হয়ে গেলাম। তারপর ওই অতটুকু মেয়ে ফেলে আমেরিকায় চলে গেলাম। ছবছর তোমাদের সঙ্গে আমার তেমন কোনও সম্পর্কই ছিল না। টুপুকে তো পালছ তোমরাই।
আমি টুপুর জন্যে তেমন কিছুই করিনি। যা করার হাসিই করেছে।
তা আমি জানি।
আমি চাই টুপুকে তুই নিয়ে যা। মেয়েটির ভবিষ্যৎ আছে। আমেরিকায় তোর কাছে থাকলে মানুষের মতো মানুষ হবে সে। এখানে পড়ে থেকে টুপুর কী লাভ! শুধু
কথা শেষ করলেন না মা। মুখটা কি রকম দুখি হয়ে গেল তার।
খালেদ বলল, শুধু কী মা?
আমি ভাবছি হাসির কথা।
হাসির কী কথা?
টুপুকে ছেড়ে হাসি যে কেমন করে থাকবে!
এই কথা অবশ্য আমিও ভেবেছি।
তারপর একটু থেমে খালেদ বলল, হাসি তা হলে আগের মতোই আছে। বদলায়নি?
কথাটা বুঝতে পারলেন না মা। বললেন, বদলায়নি মানে?
মানে বিয়েটিয়ে সে তা হলে করবেই না?
না। তা করবে না।
এটা কোনও কথা হল?
কে বোঝাবে ওকে এসব!
কিন্তু জীবন ওর তা হলে কাটবে কীকরে। টুপুকে তো আমি নিয়ে যাচ্ছি, দুচার বছর পর তুমিও মারা যাবে, তারপর?

এসব নিয়ে অনেক কথা হয়েছে।
হাসির সঙ্গে?
হ্যাঁ।
কী বলে সে?
ওই একই কথা। বিয়ে সে করবে না। এভাবেই জীবন কাটাবে।
খালেদ আর কথা বলল না।
মা বললেন, দোষ অবশ্য হাসির আমি দিই না। এটা তোদের বংশের ধারা। জীবন সম্পর্কে তোদের বংশের লোকেরা যে-সিদ্ধান্ত নেয় সেই সিদ্ধান্ত যদি কোনওরকমভাবে বদলে যায় তা হলে জীবন একেবারেই উলটেপালটে যায় তোদের। হাসির তা-ই হয়েছে।
খালেদ কথা বলল না, বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

মণিকা বলল, টুপু তুমি কি আমার কাছে আসবে না?
এই প্রথম মণিকার সঙ্গে কথা বলল টুপু। না।
কেন?
টুপু কথা বলল না।
হাসি বলল, কেন যাবে না টুপু? তোমার মা তো!
টুপু তবু কথা বলল না।
হাসি বলল, দুএকদিন যাক, ঠিক হয়ে যাবে।
মনিকা বলল, হাসি এসো, আমরা দুজন গল্প করি।
বিকেলবেলা ঘরে বসে গল্প করব কী! চলো বাগানের দিকে যাই। বাগানের মাঝখানে বাঁধানো একটা পুকুর আছে। সুন্দর ঘাটলা। সেখানে বসে গল্প করব। চলো যাই।
চলো।
তারপর ঘর থেকে বেরুল ওরা।

মণিকা বলল, টুপুকে নেবে না?
নিতে হবে না।
মানে?
টুপু এমনিতেই যাবে।
কথাটা বুঝতে পারল না মণিকা। কীরকম চোখে হাসির দিকে তাকাল।
হাসি হাসল। আমি যেখানে যাব টুপু সেখানে যাবেই।
এবার মণিকাও হাসল। ও, তা-ই বল। হ্যাঁ, আমি শুনেছি টুপু তোমাকে ছাড়া কিছু বোঝে না।
ওরা দুজন বাগানের দিকে হাঁটতে লাগল। টুপু হাঁটতে লাগল ওদের পিছুপিছু। বাগানে এসে বাগান পুকুর এবং নির্জন বাঁধানো ঘাটলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল মণিকা। চারদিকে তাকিয়ে সব দেখল। তারপর বলল, অদ্ভুত সুন্দর!
হাসি বলল, তোমার পছন্দ হয়েছে?
খুব পছন্দ হয়েছে। ভারি সুন্দর জায়গা!
ঘাটলার ওপরের দিককার সিঁড়িতে বসে পড়ল মণিকা। তার পাশে বসল হাসি। বসেই পেছন ফিরে তাকাল। টুপুকে খুঁজল।
ঘাটলার একপাশে অনেকগুলো ফুলের ঝাড়। বেশ বড় বড় হলুদ রঙের প্রচুর ফুল ফুটে আছে। দুতিনটে প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছে। টুপু সেই ফুলের ঝাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।
হাসি হাত-ইশারায় টুপুকে ডাকল। টুপু এখানে আয়।
টুপু এল না।
মণিকা বলল, টুপু কি আমাকে দেখে এমন করছে?
বোধহয়।
কোনও কোনও বাচ্চা অবশ্য এমন করে।
ভাবি তোমাকে একটা কথা বলব?
বলো।
এতদিন বিয়ে হল তোমার, বাচ্চা হয়নি কেন?
নিতে চেয়েছি।
তারপর?
আমার হবে না।
মানে?
আমি কখনও মা হতে পারব না।

বল কী?
সত্যি।
আমেরিকায় জন্মেছ, থাক আমেরিকায়, তারপর
হাসির কথা শেষ হল না। মণিকা বলল, প্রচুর চেষ্টা করা হয়েছে।
আশ্চর্য ব্যাপার তো!
মণিকা কথা বলল না।
হাসি বলল, সারাজীবন তা হলে এভাবে থাকবে!
এভাবে মানে?
বাচ্চা ছাড়া?
বাচ্চা ছাড়া কোথায়? টুপু আছে না! টুপুকে আমাদের কাছে নিয়ে যাব।
কথাটা যেন বুঝতে পারল না হাসি। বলল, এ্যাঁ।
হ্যাঁ। এজন্যেই তো এসেছি এবার।
টুপুকে নিয়ে যেতে?
হ্যাঁ।
হাসি আর কোনও কথা বলল না। ফ্যালফ্যাল করে মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।
মণিকা কী বুঝল কে জানে, কথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। তোমার কথা আমি কিন্তু সব জানি হাসি।
তখনও আনমনা হয়ে আছে হাসি। মণিকার কথাটা যেন বুঝতে পারল না সে। বলল, কী জান?
তুমি কেন বিয়ে করনি, আমি জানি। কোনওদিনও বিয়ে করবে না তাও জানি। তোমার ভাইয়ের মুখে তোমার কথা সব শুনে এত অবাক হয়েছি, আজকের পৃথিবীতে কোনও মেয়ে যে প্রেমিকের জন্যে এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, এটা ভাবাই যায় না। আমেরিকানরা শুনলে তো বিশ্বেসই করবে না। ভাববে গল্প। রূপকথা। বাঙালি মেয়ে হয়ে আমিই প্রথমে বিশ্বেস করিনি।
হাসি তবু কথা বলল না। কীরকম আনমনা হয়ে আছে সে। তার কেবল মনে পড়ে টুপু আর এখানে থাকবে না। টুপু চলে যাবে। টুপু তাকে ছেড়ে দূরে বহুদূরে কোথাও চলে যাবে।
মণিকা পাশে বসা, তবু জলে চোখ ভরে এল হাসির।

সারাটা দিন আজ বেজায় খাটাখাটনি গেছে রাজুর। দোকানঘর রেডি হয়ে গেছে। গত দুতিনদিন ধরে আস্তে ধীরে ঘরে মাল তুলছিল রাজু। এখন রাত প্রায় নটা। খানিক আগেই সবকিছু একেবারে রেডি করে দোকানে ভাল করে তালা লাগিয়ে বেরিয়েছে রাজু। কাল সকালে এসে প্রথম দোকান খুলবে সে। কাল থেকে অন্যরকম একটা জীবন শুরু হবে রাজুর। রাজু আর রাজু থাকবে না। দোকানদার হয়ে যাবে। মহাজন হয়ে যাবে। রাজু মহাজন।

এসব ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল রাজু। পকেটে দোকানের চাবি। মনটা আনন্দে ভরে আছে রাজুর। এই প্রথম মার ইচ্ছে মতন একটা কাজ করতে যাচ্ছে সে। কাজটা করতে গিয়ে রাজু টের পেয়েছে কোনও কোনও প্রিয়জনকে খুশি করার মধ্যে লুকিয়ে থাকে অদ্ভুত এক আনন্দ। অনির্বচনীয় এক ভাললাগা।

সেই ভাললাগায় বিভোর হয়ে হাটছিল রাজু।

বাজার থেকে বেরিয়ে টানা লম্বা পথটা বেশ অন্ধকার। কোথাও কোথাও রাস্তার পাশের ঘরবাড়ি থেকে টুকরোটাকরা আলো ছিটকে এসে পড়েছে রাস্তার ওপর। তাতে সামান্যই আলো হয়েছে রাস্তার কোনও কোনও অংশ।

রাস্তার আলো অন্ধকার রাজুর কাছে অবিশ্যি কোনও ব্যাপার নয়। এই রাস্তা তার হাতের তালুর মতো মুখস্থ। এই রাস্তা ধরে ইচ্ছে করলে চোখ বুজে বাড়ি পৌঁছে যেতে পারে সে। তা ছাড়া রাতের বেলা রাস্তায় গাড়ি সাধারণত থাকেই না। পনেরো-বিশ মিনিট পরপর এক-আধটা মালবোঝাই ট্রাক আসা-যাওয়া করে। এমন গোঁগোঁ করতে করতে ছুটে আসে ট্রাকগুলো, চারপাশে খবর হয়ে যায়। জায়গামতো পৌঁছুবার বেশ আগেই শব্দ পাওয়া যায় ট্রাকের। সুতরাং ভয়ের তেমন কোনও কারণ থাকে না।

রাজুর ভয়ডর অবশ্য এমনিতেই কম। সে খুবই আয়েশি ভঙ্গিতে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটে। বাস ট্রাক এলে সরে যায়।

এখনও রাস্তার মাঝখান দিয়েই হাঁটছিল রাজু। বাস তো এত রাতে আসবেই না। ট্রাক এলে দূরে থেকেই তার শব্দ পাওয়া যাবে। তখন রাস্তার পাশে সরে যাবে

রাজু। কিন্তু রাজুর নিয়তি ছিল অন্যরকম। দূর থেকে ট্রাকের শব্দ রাজু এ সময় পেল ঠিকই, ট্রাকটা আসছিল পেছন থেকে, ঘাড় ঘুরিয়ে ট্রাকের হেডলাইটের আলো দেখল রাজু, কিন্তু বুঝতে পারল না রাস্তার কোন পাশে সরে যাবে সে। ডান না বাঁয়ে।

মুহূর্তে কেমন দিশেহারা হয়ে গেল রাজু। প্রথমে ডানপাশে সরে যেতে চাইল সে, তারপর চাইল বাঁপাশে সরতে। কিন্তু তার আগেই দৈত্যের মতো মালবোঝাই ট্রাক চলে গেল রাজুর উপর দিয়ে। ধড়টা বাইরে রইল রাজুর, কেবল মাথাটা পড়ল চাকার তলায়। মুহূর্তে চারপাশের মানুষজন এবং পৃথিবীর সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক চুকে গেল রাজুর। কেউ তা টের পেল না। বাড়িতে রাজুর মা তখন ছেলের অপেক্ষায় বসে আছেন। রাজু ফিরলে তাকে ভাত খাইয়ে তবে শোবেন। মায়ের মন টের পেল না তার রাজু আর কখনও ফিরে আসবে না। বাড়ি ঢুকে হাতমুখ না ধুয়েই বলবে না, মা খেতে দাও।

হাসি কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। টুপু একহাতে তার গলা ধরে টানতে লাগল। ফুপি, ও ফুপি, কী হয়েছে তোমার?

হাসি কীরকম উদাস-করা গলায় বলল, কিছু না।

তা হলে ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে আছ কেন?

এমনি।

আমার দিকে ফেরো।

না।

কেন?

আমার এখন তোর দিকে ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

কেন? আমি কীকরেছি?

কিছু না।

তা হলে?

তুই ঘুমো।
তুমি আমার দিকে না ফিরলে আমি ঘুমোব না।
ঘুমোবি না তো কী করবি?
আমি কাঁদব।
সঙ্গে সঙ্গে টুপুর দিকে পাশ ফিরল হাসি।
কেন, কাঁদবি কেন?
টুপু তীব্র অভিমানের গলায় বলল, তুমি আমার সঙ্গে এমন করছ কেন?
কী করছি?
তুমি আমাকে আর আগের মতো ভালবাস না। আমাকে একটুও আদর কর না।
কে বলেছে তোকে?
আমি বুঝি বুঝি না।
কী করে বুঝলি?
কদিন ধরে তুমি আমার মুখের দিকে একটুও তাকাও না।
তাকাই না বুঝি?
না। আমাকে জড়িয়ে ধর না, আদর কর না। কেন আদর কর না ফুপি?
এখন তো তোকে আদর করার অনেক লোক আছে।
কে?
তোর আব্বু আম্মু।
আমি তো আব্বু আম্মুর কাছে বেশি যাই না।
যাস না কেন?
আমার ভাল্লাগে না।
কিন্তু তাদের কাছেই তো তোকে যেতে হবে। কাল থেকে তোর আব্বু আম্মুর কাছে যাবি। তারা তোকে খুব আদর করবে।
না।
কেন?
আমার ভাল্লাগে না।
কিন্তু আব্বু আম্মু তো তোকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে।
কোথায় নিয়ে যাবে?
আমেরিকায়।
কেন?
এমনিতেই। তুই তাদের কাছে থাকবি।
আর তুমি?
আমি এখানে থাকব।

তুমি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?
কথাটা এমন করে বলল টুপু, হাসি কোনও জবাব দিতে পারল না। নিঃশব্দে একটা হাত রাখল টুপুর পিঠে। জলে চোখ ভরে এল। অন্ধকারে হাসির জলভরা চোখ দেখতে পেল না টুপু।
টুপু বলল, কথা বলছ না কেন ফুপি?
ধরা গলায় হাসি বলল, কী বলব?
আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে তুমি?
তুই আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবি?
না। তোমাকে ছেড়ে একদিনও কোথাও থাকতে পারব না আমি। তুমি না থাকলে আমাকে গোসল করিয়ে দেবে কে? ভাত খাইয়ে দেবে কে? আমি পড়ব কার কাছে, ঘুমাব কার কাছে?
হাসি কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই বাইরে লোকজনের কীরকম একটা হল্লা চিল্লার শব্দ শোনা গেল। মহাসড়কের ওদিক থেকে আসছিল শব্দটি। ক্রমশ চারপাশের বাড়িতেও ছড়িয়ে যাচ্ছিল সেই শব্দ। হাসি কীরকম হকচকিয়ে উঠল।
টুপু বলল, কীহয়েছে ফুপি?
বেড-সুইচ টিপে লাইট জ্বালল হাসি। কী জানি! বুঝতে পারছি না তো!
আমার ভয় করছে।
কিসের ভয় মা? আমি আছি না!
তুমি আমাকে কোলে নাও।
টুপু দুহাতে হাসির গলা জড়িয়ে ধরল।
হাসি বলল, এত বড় মেয়েকে কোলে নেয়া যায়!
তবু টুপুকে কোলে নিল হাসি। বিছানা থেকে নামল। ততক্ষণে মার রুমে মাও উঠেছেন। পাশের রমে উঠেছে ভাইয়া-ভাবি। পরীও উঠেছে।
পাশের ঘর থেকে ভাইয়া চিৎকার করে বলল, কী হয়েছে মা?
এ-ঘর থেকে মা বললেন, বুঝতে পারছি না।
তারপর দরজা খুলে উঠোনে বেরুলেন মা। তাঁর সঙ্গে বেরুল পরী। পাশের ঘর থেকে ভাইয়া-ভাবিও বেরুল। টুপুকে কোলে নিয়ে হাসি এসে দাঁড়াল দরোজার সামনে।
টুপু বলল, এবার আমাকে নামিয়ে দাও ফুপি। এখন আমার আর ভয় করছে না।
টুপুকে কোল থেকে নামিয়ে দিল হাসি। ঠিক তখুনি পাশের বাড়ির রতন ছুটতে ছুটতে এল হাসিদের বাড়ি। ভয়ানক উত্তেজিত গলায় বলল, রাজু মারা গেছে। ট্রাকের চাকার নিচে মাথা চলে গিয়েছিল। মাথাটা একবারে চ্যাপটা হয়ে গেছে। আমরা লাশ আনতে যাচ্ছি।

যেমন ছুটতে ছুটতে এসেছিল রতন তেমনই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। এমন আচমকা সংবাদটি দিয়ে গেল সে, কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। যে যেখানে ছিল সেখানে স্তব্ধ হয়ে রইল। কেবল হাসি কেন যে টুপুকে টেনে আনল বুকের কাছে, টুপুকে জড়িয়ে হুহু করে কাঁদতে লাগল। কান্নাটা রাজুর জন্য, না টুপুর জন্য, নাকি হাসির সেই হারিয়ে যাওয়া মনের মানুষটির জন্য, হাসির মন ছাড়া কেউ তা জানে না।

পেছন থেকে পা টিপে টিপে এসে দুহাতে টুপুকে জড়িয়ে ধরল খালেদ। মণিকাও ছিল তার সঙ্গে। মণিকা খিলখিল করে হাসতে লাগল। আর খালেদের কোলে টুপু তখন হাঁসফাঁস করছে। পাগলের মতো মোচড়ামুচড়ি করছে।
খালেদ বলল, অমন কোরো না মা!
টুপু মোচড়াতে মোচড়াতে বলল, তুমি আমাকে ধরেছ কেন? ছাড়ো।
না, ছাড়ব না। আমি তোমাকে খুব আদর করব।
না ছাড়লে আমি তোমাকে একদম কামড়ে দেব।
আচ্ছা কামড়াও।
তবু ছাড়বে না?
না।
টুপুর তারপর হঠাৎ করেই কীরকম শান্ত হয়ে গেল।
খালেদ বলল, মাগো, বলো তো আমি তোমার কে?
টুপু বলল, বলব না।
কেন?
তুমি ভাল না।
পাশে দাঁড়িয়ে আছে মণিকা। হাত বাড়িয়ে টুপুর গালটা ছুঁয়ে দিল সে। কেন মা, ভাল না কেন?
তুমিও ভাল না।
কেন, কী করেছি আমি।

তোমরা আমাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে কেন?
তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে।
না, আমি যাব না।
কেন?
ফুপিকে ছাড়া কোথাও যাব না আমি।
খালেদ বলল, তা হলে আমরা তোমার ফুপিকেও নিয়ে যাব।
সঙ্গে সঙ্গে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল টুপুর। সত্যি?
মণিকা বলল, সত্যি।
তুমি খুব ভাল।
আমাকে তুমি তা হলে আম্মু বলে ডাকো।
ফিক করে হেসে টুপু বলল, আম্মু।
সেই ডাকে কী যে হল মণিকার! জলে চোখ ভরে এল তার। খালেদের কোল থেকে প্যাগলের মতো ছিনিয়ে নিজের কোলে নিল টুপুকে। টুপুর ঘাড়ে গলায় গালে কপালে চুমু খেতে লাগল।
ঘরের জানালা থেকে দৃশ্যটা দেখতে পেল হাসি। দেখে বুকের ভেতর কেমন যে করে উঠল তার! মনে হল তার বুকের মানিক ছিনিয়ে নিচ্ছে অন্য আরেকজন। ছুটে গিয়ে মণিকার কোল থেকে টুপুকে ছিনিয়ে নেয়ার ইচ্ছে হল হাসির। কিন্তু কোন অদৃশ্য শত্রু যেন হাত-পা জড়িয়ে ধরে রাখল তার। হাসি একটুও নড়তে পারল না।

খালেদ বলল, আমি জানি তোর খুব কষ্ট হবে। তবু কাজটা করতে হবে।
ভাইয়ার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না হাসি। চোখ তুলে ভাইয়ার মুখের দিকে তাকাল।
হাসির মুখচোখ কীরকম ফোলাফোলা। অদ্ভুত এক দুঃখ কিংবা বিষাদ ঘিরে আছে। এই মুখের দিকে তাকালে যে-কারু মায়া লাগবে।

খালেদেরও লাগল। মুহূর্তকাল হাসির মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল সে। বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

খালেদ বলল, আমরা কাল সকালেই চলে যাব। তুই তো জানিসই টুপুকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি। আসলে টুপুকে নেয়ার জন্যেই এবার আসা।

হাসি তবু কথা বলল না।

খালেদ বলল, টুপু তো কিছুতেই তোকে না নিয়ে যাবে না। এজন্যে টুপুর সঙ্গে সকাল বেলা আমাদের একটা চালাকি করতে হবে।

হাসি চোখ তুলে খালেদের দিকে তাকাল।

খালেদ বলল, সকাল থেকে টুপু যেন তোকে দেখতে না পায়। আমরা টুপুকে বোঝাব তুই খুব সকালের বাসে ঢাকা চলে গিয়েছিস। ঢাকা থেকে আমাদের সঙ্গে আমেরিকায় যাবি।

খালেদের কথা শুনে জলে চোখ ভরে এল হাসির। চোখের জল সামলাতে অন্যদিকে মুখ ফেরাল সে।

খালেদ বলল, আমি সব বুঝি। টুপু চলে গেলে তোর আর কিছুই থাকল না। তবু টুপুর ভালর জন্যেই তোকে এই ত্যাগটা স্বীকার করতে হবে। মা যতদিন বেঁচে আছেন তুই এখানেই থাক। তারপর তোকেও আমি আমেরিকায় নিয়ে যাব।

এবার আর কান্না ধরে রাখতে পারল না হাসি। মুখে আঁচল চেপে হুহু করে কাঁদতে লাগল।

হাসিদের বড়ঘরটা আসলে দেড়তলা। মাথার ওপর কাঠের চমৎকার পাটাতন দেয়া। ওপরে ওঠার সরু একটা সিঁড়ি আছে। ভোরবেলা চুপিচুপি টুপুর পাশ থেকে উঠে সেই দেড়তলায় উঠে গেছে হাসি। তারপর সিঁড়ির মুখের দরোজাটি ওপর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

ওপরে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি জানালাও আছে। উঠোনের দিকের জানালাটি সামান্য ফাঁক করে দিয়েছে হাসি। দিয়ে হাত-পা ভেঙে অসহায় মানুষের মতো

বসে আছে জানালার সামনে। কাল রাত থেকে কান্না বোধহয় মুহূর্তের জন্যেও থামেনি তার। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল শেষ হয়ে এসেছে। এত কান্না বহুকাল কাঁদেনি হাসি।

তবু কোত্থেকে যে বারবার ঠেলে ওঠে কান্না।

এই জানালা থেকে উঠোনের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মাইক্রোবাসটা দেখা যায়। ড্রাইভার এবং পরী এই দুজন মিলে আস্তে ধীরে ব্যাগ সুটকেস সব গাড়িতে তুলছে। আমেরিকা থেকে আনা সুন্দর ফ্রক আর জুতো-মোজা পরে, মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা টুপু লাফালাপি করে বেড়াচ্ছে উঠোনে। তীব্র আনন্দে যেন ফেটে পড়ছে সে।

একসময় মণিকা খালেদ আর মা এসে দাঁড়ালেন মাইক্রোবাসের সামনে। মণিকা এবং খালেদ পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল মাকে। মা টুপুকে জড়িয়ে ধরে খানিক কাঁদলেন, তারপর নিজেই টুপুকে তুলে দিলেন গাড়িতে।

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিল। মুহূর্তে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

ঠিক তখুনি রাজুদের বাড়ি থেকে রাজুর মায়ের তীব্র বিলাপের শব্দ ভেসে এল। রাজু ও রাজু, আমাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেলি তুই! আমার কথা একবারও ভাবলি না বাবা! তোকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকি!

রাজুর মায়ের বিলাপ শুনে হাসির মনে হল বিলাপ রাজুর মা করছে না, তার বুকের ভেতর বসে করছে টুপুর মা। টুপু, ও টুপু, আমাকে ছেড়ে তুই কোথায় চলে গেলি মা! আমার কথা একবারও ভাবলি না! তোকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকি!

পাটাতনের ওপর লুটিয়ে পড়ে হুহু করে কাঁদতে লাগল হাসি। সেই সময় টুপুর পাশাপাশি আরেকজন মানুষের কথা মনে পড়েছিল হাসির। সেই মানুষটিও চলে গিয়েছিল। আর কখনও হাসির কাছে ফিরে আসেনি। আজ টুপু গেল, টুপুও কি আর কখনও ফিরবে?

হাসির জীবন থেকে প্রিয়জনদের কেবল যাওয়া আছে– ফেরা নেই।

হাসির কাছে কেউ কখনও ফিরে আসে না।